


## শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

SARASWAT LIB…
Estd. 1919

মূল্য আড়াই টাকা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড্ সন্স্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩।৮ জনসন রোড, ঢাকা

১৩৫৩

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
মহাশয়ের করকমলে

সোনার তুলিতে মাখায়ে মনের রং
জগৎ রঙালো ঐ হাতখানি তব।
রঙের নেশায় বিভল পাগল তুমি,
মরমী মনের ছবি আঁকো নব নব।
আমার পুঁথিতে তোমার তুলির টান
পাতার কুটিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ-মত।
সার্থক হ'ল গ্রাম্য-পাঁচালী মোর,
পল্লীর কবি ধন্য হইল কত!

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৫২

বিনীত
শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন
৬. ৪. ৪৪.

সাদরসম্ভাষণমেতৎ—

আপনার লেখা "কবি-তীর্থের পাঁচালী"গুলি মুখে মুখে শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি। এইগুলি ছাপা হয়ে বার হ'লে সাধারণ পাঠক প'ড়ে সুখ পাবেন এই আশা করছি। এই গীতগুলিতে পল্লীজীবনের অনেকগুলি মনোরম চিত্র পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারবে এই আমার বিশ্বাস এবং এই লেখাগুলি থেকে স্বর্গীয় কবিগুরুর একটুখানি যৌবনকালের ইতিহাসও পেয়ে তাঁরা লাভবান হবেন। এমন সরল সুন্দর কবিতাগুলি ছাপাতে বিলম্ব করবেন না।

ভবদীয়—
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## কবি-তীর্থের পাঁচালী

ব্যথা-বেদনায় লিখিয়াছি দিয়া রক্তের লাল কালি।
যদি থাকে তব হিয়া দগদগি সমবেদনায় ভরা—
ঘৃণ্য অধম মানুষ যাহারা, বাঁচিয়াও আজ মরা,
তাদের কাহিনী শুনিবার মত দরদী প্রাণেতে ঠাঁই,—
শুনগো বন্ধু, নিরিবিলি বসি' তারি দুটো গান গাই।

বহুযুগ ধরি মাটির পৃথিবী যাদেরে লইয়া কোলে
প্রাণের আবেগে মর্ম্মের গান শুনায়েছে কত ছলে,
যুগ-পারাবার পার হয়ে তারা ছায়াসম ভেসে আসে,
অতি পুরাতন ভুলে-যাওয়া ছবি রামধনু-রঙে হাসে,
প্রকাশ-ব্যথায় কাঁদে যে তাদের জীবনের রসধারা,
তাদের গ্রাম্য পাঁচালী গাহিব ছন্দশাসন-ছাড়া।
এ কবি-তীর্থ-মাটি
বিশ্বকবির চরণের ধূলা পরশি' হয়েছে খাঁটি।

প্রকৃতি-মায়ের দুলাল-দুলালী রচেছিলো ইতিহাস
প্রতিটি কাহিনী তার আজি হায় ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।
প্রাচীন পল্লীসমাজ-দেহের কঙ্কাল পড়ে আছে,
মুখর যুগের উদ্ধত পদে নীরবে করুণা যাচে।
সর্ব্বহারা সে পল্লীমাতার নিদারুণ আবেদন,
দেশের দগ্ধ অন্তরলোকে তুলিবে কি শিহরণ?

গাঁয়ের বৈরাগী পুরোনো খোমকে বাড়ী বাড়ী গায় ছড়া,
অবহেলাতেও অযাচিত গান প্রাণের ছন্দে গড়া
এ অশথ ছায়ে বসি,
পূবাল হাওয়ায় গাহি গান—শুন, হৃদয়ের প্রতিবেশী!



কলসী রেখে মেয়েরা নায় ঘাটে

( শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে )

মুখপত্র




গাঙের ধারে অশথ্‌-তলার ঘাটে
'চাম্‌রু বুনো' আজ সারাদিন খাটে,
কোদাল ধ'রে বানাচ্ছে ঘাট,
ভিঁড়বে হেথায় বাবু-মশা'র বোট।
কলাগাছের গেট বানিয়ে
হল্লা করে অনেক ছেলের জোট।
—তখন শরৎকাল!
অশথ্‌-তলায় ধানের মড়াই
—সেই সকাল বিকাল।

নতুন আউস্ ধানের গন্ধে
কী আনন্দে মাত্‌লা বাতাস নাচে,
কাঁচা সোনার ধানের বাইলে
সোনালী রোদ্ চিক্‌মিকিয়ে হাসে।
ধানের পালার পাশে ব'সে
কী আনন্দে বলদ্, গরুগুলি,
কী মিষ্টি যে ধানের বাইল্
খাচ্চে সুখে সব মেহানৎ ভুলি'।
পুবাল হাওয়া বয়—
আজ আস্‌বেন এই ঘাটেতে
মোদের রাজা বাবু-মহাশয়।
কল্‌সী রেখে মেয়েরা নায় ঘাটে,
ছেলেরা সব ঘোলা জলে—
ডুবিয়ে সাঁতার কাটে।
"ঐ আস্‌ছে বাবু-মশা'র বোট"—
আঙুল তুলে দেখায় তারা দূরে,—
"ছাড়িয়ে এলো এ্যাতক্ষণে
নিশ্চয়ই ঐ পাবনা বাজিত্‌-পুরে"—
"ঐ দেখা যায় মস্ত বড় পাল,
বোটের মাথায় ঐ উড়ে যায়
গাংশালিকের পাল।
'তপ্‌সী' মাঝি ঐ যে নাড়ে হাল।

সাদা মেঘের একটু নীচে
ভরা গাঙের অথৈ হলদে জলে,
পদ্মাবুকে হেলে দুলে
বাবু-মশা'র বোট যে নেচে চলে।



মেঘ-ভাঙা ঐ চিক্‌চিকানো রোদ
হালে পালে হেসে নেচে
কর্চ্ছে কী আমোদ!
বাঁক্ ঘুরেই ঐ সাদিপুরের চর,
ঝাউএর সারি ছাড়িয়ে অতঃপর,

আর বেশী দেরী নয়,
এই বেলাতেই পৌঁছে যাবেন
মোদের রাজা বাবু-মহাশয়।"

এ যেন সেই ময়ূরপঙ্খী নাও!
কোন্ অজানা দেশ থেকে কোন্ রাজপুত্রে নিয়ে
কোন্ সমুদ্রে কবে যেন হয়েছে উধাও!
কোন্ ঘুমন্ত রাজকন্যা তরে
এই গাঁয়ের ঘাটে সন্ধ্যাবেলা ভিঁড়ে!
"রাজকন্যে! জাগো জাগো,
ঘুমোয়া না আর!"
বাজিয়ে বাঁশী রাজপুত্র বল্‌ছে বারে-বার।
মিলন হ'ল,—সে যেন কোন্
জ্যোৎস্নামাখা গন্ধে ঘেরা শারদ নিশীথে,
সে মিলন কেউ পায় নি দেখিতে!
সে রহস্য—সেই যে গোপন
নীরব সাঁঝের প্রণয় অভিসার
কেউ দেখে নি আর।
সেই ছবিটী আজো গাঙের বুকে
ঢেউএর নাচন জাগায় বারে-বার!

---

শিলাইদহের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে 'বাবু-মশাই' বল্‌তো।



খেয়া-ঘাটে ভিড় করেছে পদ্মাপারের লোক ( কুষ্টির হাট )

( শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে )




কুঠীর হাটে যাবো আমি, তোল্ মা মরিচ তোল্
তিনু, চুনু, ঘুরিস্ কেন,—করিস্ কেন গোল ?
আমি যাবো কুঠীর হাটে কর্‌তে বেচা-কেনা
ভাটেল্ হ'ল,—এখন তোরা মাকে ছেড়ে দেনা !
ভুরোর দানার রাঁধবে পায়েস পেট্‌টি ভ'রে খাবি,
সন্ধ্যা হ'লে হরি-সভায় কেত্তনেতে যাবি ।
চল্ মা এখন মরিচ-ক্ষেতে—এই ঝুড়িটা নে,
লাউ পেড়ে নে' আসি আমি ঐ ধামাটা দে ।
লঙ্কা মরিচ পেকে আছে বাগান ক'রে আলো ;
আন্ মা তুলে ধামা নিয়ে, মা'মণি মোর ভালো ।
তোর তরে মা আনবো দেখিস্ হাটের সেরা হাঁড়ি,
এ পাড়াতে তেমন বাস্থন নাইকো কারো বাড়ী ।

আনবো মাগো তামাক-পাতা শিবের জটার মতো,
পাতার গুঁড়ো দাঁতে দিতে ভালোবাসিস্ কতো।
সত্যি মাগো নানান সদায় আনবো তোরি তরে,
বুঝবে তখন কিনু তোমার কতো বুদ্ধি ধরে।
এখন মাগো আনো তুলে লঙ্কা ক' সের লাল,
বলবো হাটে, নেন্ বাবু মোর লঙ্কা বেজায় ঝাল!"
ছ'সেরেতে ছ'টি আনা,—ছ'টি লাউএর দাম
চার আনা পাই যদি মাগো, তাতেই হবে কাম।
তোলাদারের পয়সা দেবো ছুটির বেশী নয়,
যা হোক ক'রে গুঁজবো ট্যাঁকে পয়সা আনা নয়।
বসতে হবে ত'—বাজারে যদুদাসের ডাইনে,
তা হলেই মা গাহাক্ মেলা চাইবে আমার পানে।
ভুলো না মা সঙ্গে দিতে বাটখারা আর দাঁড়ি,
হাটের বেলা গেল মাগো বেরোই তাড়াতাড়ি।
ক্ষারে কাচা কট্‌কীখানা রাখলে কোথায় তুলে?
প'রবো সেটা, ঝাঁকা মাথায় চলবো দুলে দুলে।
চোঙা থেকে দাও না আমায় একটু সরসে তেল,
বাগিয়ে সিঁথি নেবো মাথায় বাব্‌রি চুল অঢেল্।
লাল গামছা দাও তো দেখি, বাঁধি বাব্‌রির পর,
দেখ্‌ না মাগো, দেখায় নাকি আমায় নতুন বর?
কোথায় গেল তেলপাকানো হাত-লড়িটে মোর,
দে লাঠীগাছ, লাঠীই হ'ল চাষার ছেলের জোর।

কাঁকুই দিয়ে চুল আঁচ্‌ড়ে শেষ হয়েছে সাজ,
তেল মেখে মুখ বাব্‌রি চুলে মানিয়েছে বেশ আজ।
দে না মাথায় ঝুড়ি তুলে,—লাউ-মরিচের বোঝা,
পাট-ক্ষেতের পাশ ঐ রাস্তাই কুঠীর হাটের সোজা।
আনবো কিনে কি কি সদায়, বল্‌ মা এখন বল্‌।
একটু দাঁড়া ভজহরি, একসাথে যাই চল্‌।
আনবো কিনে গাদাপুরু টাটকা ইলিস্‌ মাছ,
মায়ের হাঁড়ি, তামাক পাতা, বেগুনচারা গাছ।
বেচা-কেনা সারা হ'লে, এক পয়সার বিড়ি
কিনে নিয়ে টেনে টেনে দেখবো ঘুরি ফিরি—
কামার দোকান, তামাক দোকান, দুধের ভাঁড়ের সারি,
মটর কলাই বোঝাই কত বস্তা ভারী ভারী।
বট্‌তলাতে নৌকা বাঁধা—বোঝাই কত মাল,
পাবনা থেকে আস্‌ছে—কত নৌকা তোলা-পাল।
সোনার সাঁঝের কলধ্বনি নদীর বুকের গান,
হাটের হাজার লোকের গলার মেঘের মতন তান।
ইচ্ছে করে বাঁকে ব'সে প্রাণভরে তাই শুনি,
এলো গেলো নৌকো কত, তাই সারাদিন গুনি।
পাড়ের উপর গাংশালিকের সুখের কলরব,
চরের উপর শেষ করেছে আনন্দ উৎসব।
ব্যাপারীরা আসছে কেহ, ফিরছে নিয়ে বোঝা ;
মাঠের আলে বাব্‌লা-বনের পথটি ধ'রে সোজা।

যাচ্ছে ফিরে গাঁয়ের বাবু হাটের সদায় শেষে,
লাউ-কুমড়ো আনাজ নিয়ে ফির্‌ছে নানান্ বেশে।
কেউ বল্‌ছে মাছের দর আজকে বেজায় চড়া,
কারো হাতে কলসী, পান, পাকা কলার ছড়া।
কারো কোঁচে, কারো মাথায় বেতের ঝুড়ির পরে,
গৃহস্থেরা মাটির শিশু নিচ্ছে আপন ঘরে।



গরীব যারা ফিরছে ঘরে কিনে চাল্ আর নুন,
তাদের ঘরের ছেলেমেয়ে ক্ষিদেয় কেঁদে খুন।
হাসি শুধু চিন্‌লো নারে তাদের মলিন মুখ
আর সবারই ফুটছে মুখে বেচা-কেনার সুখ।

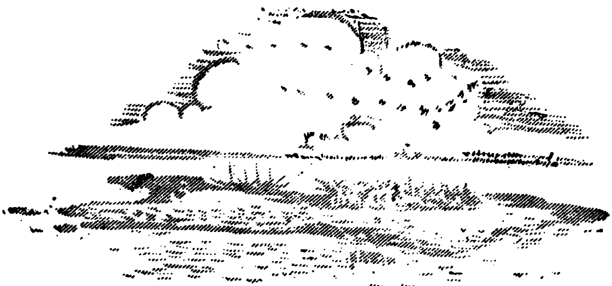
* * * *

সন্ধ্যা হ'ল, ব্যাপারীরা জ্বাললো তাদের ডিবে,
নদীর হাওয়ায় নাওএর আলো যাচ্ছে নিভে নিভে।
খেয়া-ঘাটে ভিঁড় করেছে পদ্মাপারের লোক,—
ব্যাপারীরা গুনছে আলোয় পয়সা থোকে থোক্।
দূর থেকে ঐ আসছে ভেসে আড়বংশীর গান,
বেচা-কেনা শেষ হ'লরে—উদাস করে প্রাণ।
আঁধার হ'ল, ফিরবো এখন বুনোপাড়া দিয়ে,
মা যে আমার ব'সে আছে ভাই-বোনদের নিয়ে।
গাঁয়ের মাঝে বাজছে দূরে খোল আর করতাল,
ঘুমপাড়ানী গান গাইছে ঝিঁঝিপোকার পাল।
জেলেরা সব রাঁধছে নাওয়ে ইলিশমাছের ঝোল,
গাঙের বুকে তাদের আলো কাঁপছে খেয়ে দোল।

* * * *

অশথ-ডালে ডাকছে প্যাঁচা, নিঝুম্ হ'ল গাঁ,
বাড়ীর কাছে এলাম বুঝি, এই গলির ঐ বাঁ।
'মাগো' ব'লে উঠান-মাঝে যেম্নি আমি ডাকি,
মা আমারে বুকে নিয়ে চুমোয় দিল ঢাকি।

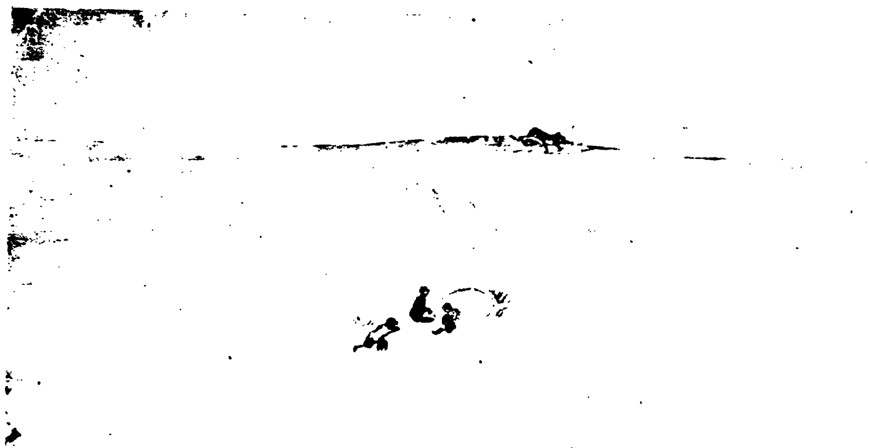
———



# মাদারতলার চর

পদ্মাচরে 'মাদারতলার ছাম্‌'!
ক্ষেত-খামারে পূর্ণ আমার সুখের স্বর্গধাম।
চারটে বলদ, চারটে মহিষ, পাঁচটা দুধেল্‌ গাই,
দুটো লাঙল, একটা গাড়ি, ডজনখানেক ছাগল-ভেড়া;
—ছিল আমার সাত-সাতটা—
যমের মত ভাই।
হায়! আজকে তারা নাই।

হায়রে বালুর চর!
মরুর বুকে ধান ফলাতাম, মটর মসুর, কলাই, ছোলা,
ঢেউ খেলাতো বাতাস তরতর।
লক্ষ্মী বাঁধা ছিলেন আমার ঘর।



স্বর্গ আমি বানিয়েছিলাম মাদারতলার চরে

( শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসুর সৌজন্যে )

( মাদারতলার চর )

বউ চল্‌তো ছেলে কোলে আন্‌তে গাঙের জল,
নেচে নেচে সোনার বরণ পাকা ধানের শীষ্‌
তার বুকেতে হাসতো খল-খল্‌।
কোমল হাতে সরিয়ে তাদের ঘোম্‌টা খোলা
আলুথালু বেশ,
নামিয়ে খোকা কল্‌সী প্রিয়া লজ্জা জড়োসড়ো
বাঁধ্‌তো তাহার কেশ।
বাড়্‌তো আমার চোখের নেশা প্রিয়ার ভঙ্গী দেখে,
নিড়ান হ'ত শেষ!
সারাদিনের খাট্‌নী আমার লাগ্‌তো বড় মিঠে
থাকৃতো নাকো মেহানতের লেশ।

পাঁচটি ভায়ের বিয়ে—
কলাই মটর ছোলা বেচে দিলাম জাঁকে দিয়ে।
আনন্দ আর ধরে না মোর ঘরে,—
স্বর্গ আমি বানিয়েছিলাম মাদারতলার চরে!
বৌমারা সব গোলায় তুল্‌তো ধান,
গিন্নী হাস্‌তো ছেলে কোলে,
গরবে মোর বুক ফুল্‌তো,—
কী আনন্দে নাচতো আমার জান্‌।
তাওই, মাওই, কুটুম্‌ স্বজন আস্‌তো আমার বাড়ী,
পাড়ার মাঝে বাড়্‌তো আমার মান।

সাতটী ভায়ের দাদা আমি,
আমার আবার ভাবনা কিসের ?
কী মিষ্টি সে ভালোবাসার টান্।

বর্ষা আমার মিতে !
ফী বছরে ধোত্ হ'ত, দেওয়ার কী সে মাতামাতি
আমার বাড়ী ডুবতো শিকস্তীতে।
বলদ্, গরু, চাল, খুঁটি আর সর্ব্বস্ব মোর নিয়ে
নৌকোবোঝাই কশবা গাঁয়ে হাজির হতাম গিয়ে।
কার্ত্তিকের সেই মিঠে মিঠে শীতে,—
মাদারতলা হাসতো পয়স্তীতে।
পলিমাটির চক্‌চকে ঢেউ—
হেথায় হোথায় শ্যামল কাশের বন,
ডাক্‌তো আমায় "এসো বন্ধু,
আমি তোমার কেনা গোলাম,
ব'সে আছি নিয়ে তোমার ধন।
কী খুসীতে ভাইরা আমার সব
কী আনন্দে বাঁধ্‌তো সোনার ঘর, আমার ছাগল গাই বলদে
কী উৎসাহে করুতো কলরব !
কাঁচি চরে ছড়িয়ে বিছন সুখে
সুরু হ'ত চৈতালী উৎসব।

ঘরের পাশেই 'রুইমারীর' সে কোল্।
নীল জলে তার শীতের হাওয়া—
খেল্‌তেছিল দোল্।
বাবু-মশা'র বোট লেগেছে সেদিন পূবের পাড়ে।
বোটের মাথায় বাবু-মশাই বসেছিলেন
নারদ ঋষি যেন,—
চেয়েছিলেন আমার বাড়ীর ধারে।



তীরে থেকেই করনু সেলাম আমি
জিজ্ঞাসিলেন—"এই কি তোমার বাড়ী?"
কেমন চল্‌ছে চাষ এবারে"—
একটুখানি থামি—

নেমে এলেন তীরের উপর, কলাই-খেতের উপর দিয়ে,
“আসুন রাজা, আমার কুঁড়ে ঘরে।”
আমার বুকের সব আনন্দ, বানের জলের মত—
বেরিয়ে এলো আমার গলার স্বরে।
বাবু-মশা’র হাসিমাখা মুখে—
চাঁদের আলো ফুট্‌লো আমার ঘরে।
আনন্দে মোর চক্ষু দুটো ঝরে।

আমার মাদারতলার ঘর
ধন্য আজি হয়ে গেল, রাজার পায়ের জুতোর দাগে,
এমন ধন্য হয় নি অতঃপর।
আমি চাষী তুচ্ছ মানুষ, এমন রাজার ধন্য প্রজা—
মা লক্ষ্মী করতে নারেন পর।
বাবু-মশা’র পায়ের ধূলি পেলাম সেদিন নিজের ঘরে,—
গ’লে গেল আনন্দে অন্তর।
আমার—ধন্য সোনার চর।



একটা কালো দাগের মত মিলায় বহুদূর　　　　　　　　( হানিফ্ চাচা )

( শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসুর সৌজন্যে )



# হানিফ্ চাচা

হানিফ্ চাচা বুড়ো মানুষ, লম্বা দাড়ী গোঁফ,
কাঁচায় পাকায় মুখ মাথা বুক শুধুই চুলের ঝোপ।
পদ্মার ঠিক পাড়ীর উপর হানিফ্ চাচার ঘর,
সেখান থেকে বেশ দেখা যায় কাল্‌কেপুরের চর।
—ঐ তো দূরে ধূ-ধূ বালি, কোথাও ঝাউএর সারি,
হেথায় সেথায় খড়ের চালে বিন্দী পাড়ার বাড়ী।
অনেক দূরে রাণীনগর, চর সদিরাজপুর,
হানিফ্ চাচার বাড়ী থেকে কোরোশ্ তিনেক দুর।
সদ্‌রেজপুর, কোটপাড়া গাঁ, অনেক দিনের আগে
কার শাপেতে পড়লো রে হায় পদ্মামায়ের রাগে।
পদ্মা যেন হাঁ করে মুখ রাক্ষুসীরই মত
গরাস ভরে গিল্‌ছে মাটি গাছ-পালা সব যত।

গাড়ী বোঝাই ঘর দরজা, সঙ্গে ছেলে-মেয়ে
জোত্‌দারেরা পালিয়ে এলো 'ফুরুৎ পুরে' ধেয়ে।
—গল্প শোনা সেই ভাঙ্গনের, সেই সদিরাজপুর—
একটা কালো দাগের মতন মিলায় বহু দূর।
হানিফ্‌ চাচার ঘাটে এলে কতই মনে পড়ে
বছর বছর পদ্মা হেথায় হরেক মূর্ত্তি ধরে।
কখনো বা লম্বা চড়া, কখন উঁচু পাড়ি,
ঘাটের উপর হানিফ্‌ চাচার মুখশুদ্ধ দাড়ি।
সাম্‌নে দিয়ে পদ্মা সদাই গাইতো কলগান,
হু-হু ক'রে বইতো বাতাস সারাটি দিনমান।
হানিফ্‌ চাচার বাড়ী ঘিরে কাঁঠাল-কলাগাছ,
সেই গাছেতে ফিঙ্গে চড়ুই করতো ভোরে নাচ।
একটা ছিল কাঁঠালগাছ, ঝাঁকড়া বেজায় মোটা;
তারি গোড়ায় থাক্‌তো দুটো বলদ মোটা-সোটা।
তারি ছায়ায় জলচৌকিতে ব'সে হানিফ্‌ সেখ,
তামাক খেতো, কপালভরা দুশ্চিন্তার রেখ।
নদীর পানে মুখটি তুলে কখন চেয়ে থাকে,
দুই একটি কথাও কয়, নিতান্ত ডাক্‌ হাঁকে।
কখনো বা ভুঁই নিড়িয়ে গুনগুনিয়ে গায়,
লোকটা ছিল কেমনই বা, বুঝাই ছিল দায়।
দুখান্‌ ছিল নিম্‌-আট্‌-চালা, একটি গোয়াল-ঘর,
কাঁঠালতলায় তবু চাচা থাকতো নিরন্তর।

খেয়া-ঘাটের নাও লাগতো রসি খানেক দূরে,
রাস্তা ছিল হানিফ্ চাচার কাঁঠালগাছটা ঘুরে!
বল্‌তো পথিক—"ক'চ্ছ কিগো, কেমন আছ চাচা?"
বল্‌তো চাচা "খোদার দোয়ায় ভালোই আছি বাছা।
যাচ্ছ কোথায়? কলুবাড়ী? আচ্ছা বাবা যাও!"
তার বেশী আর বলতো নাকো হাঁ কিংবা না'ও।



নদীর গানে উদাস সুর, উদাস হাওয়া বয়,
আন্‌মনা হায় চাচার কানে কিসের ব্যথা কয়।
ঘরের কাছে বিঘে দুই-এর একটি ছিল ক্ষেত,
সেই ক্ষেতেরই ফসল বেচে ভরতো চাচার পেট।

চাল্‌কুমড়া, সয়লা বেগুন,—সবড়ী আনাজ কলা
ব্যাপারীরা ঝুড়ি বোঝাই করতো কাঁঠাল-তলা।
কেন উদাস মনমরা হায় হানিফ্‌ চাচা; জানো ?
মানুষও যে পাষাণ বনে সে কথা কি মানো ?
কাঁঠালগাছের পূবের পাশে ঐ যে হোথায় ভূঁয়ে,
সাত কবরে সাতটি ছেলে,—বাছারা সব শুয়ে।
বাছারা সব ঘুমিয়ে আছে বাপের বুকের কাছে,
বাজে পোড়া বটের মতন হানিফ্‌ আজও বাঁচে।
হানিফ্‌ চাচার গিন্নী ম'ল ভাঙন মাটি চাপা,
সবই গেল শেষ বয়সে, হৃদয়টি তার ফাঁপা।
সাতটি চ্যারাগ্‌,—জলুস্‌ কতো,—নিভলো একে একে,
যে জ্বালালো, সেও যে গেল স্মৃতির বোঝা রেখে।
সাতটি ছেলের সাতটি কবর, গাছের শান্ত ছায়ে,
সেই কবরে কাঁঠালপাতা পড়তো পুবাল্‌ বায়ে।
ভাব্‌তো বসে বাবুমশা'র অসীম দয়ার কথা,
গরীব কালে তাঁহার পায়ে জানিয়েছিল ব্যথা।
তাঁরি দয়ায় জমাজমি দশের মাঝে মান,
বৌ, ব্যাটাপুত্‌, টাকাকড়ি গোলায় বোঝাই ধান।
আজ কোথা সেই দয়াল বাবু, নাই সে হানিফ্‌ আর
খোদার ডাকে ছেড়ে যাবার সময় হ'ল তার।
হানিফ্‌ চাচা চেয়েই থাকে নাইকো মুখে বাণী ;
জীবনে তার নাইকো তাড়া, নাই কোনও হয়রাণী।

*　　*　　*　　*

তেরো সালের আশ্বিনে ঝড় প্রলয় নিয়ে এলো,
ঘোষপাড়া আর জেলেপাড়া শ্মশান ক'রে দিলো।
সেই ঝড়ে হায় হানিফ্ চাচার বাড়িটি নিঃশেষ,
ছোট্ট একটি দোচালা ঘর রইলো অবশেষ।
বাঁধতো তখন উজান ষ্টীমার এই হানিফের ঘাটে,
বাবুমশা'র বোট বাঁধতো পূবের ধারের মাঠে।
হানিফ্ চাচার বাড়ীর এখন চিহ্নটিও নাই,
নামটি আছে 'হান্‌ফের ঘাট' আজো শুনতে পাই।



# আমিনসার ভাসান

ভাসানের দল গড়েছে আমীন সা
রোজ রাতে তার দারুণ মহলা চলে,
বিপিন, ভোলা ও তমিজ, মেহের সেখ
ছেলে বুড়ো ঢের জড়ো হয় দলে দলে।

মনসা-ভাসান গাহেন হইবে গাঁয়ে
দলের পেরধান্ গাহেনী আমীন সা,
"যাত্রাগানেরে টেক্কা যে দিতে হবে"
হুঁকো টেনে বলে দাড়ি নেড়ে হামেসা।

"ভালো ক'রে সবে বক্তিমে গুলো শেখ,
চারুবাবুদের যাত্রা তো শুনেছিস্ ?
চাষা ব'লে কেউ ঘেন্না যেন না করে
শুরুদ্দু ভাষা কইবিরে বুঝেছিস্!

রাজা রাণী আর বেহুলা লখিন্দর
সাজিবে বিপিন, তামিজ, মেহের, ভোলা,
মন্ত্রী সাজিবে মোদের লোহাই চাচা
উঠে পড়ে লাগ, বক্‌সিস্ রলো তোলা।

যদু দাস দিবে রাজার ভাঁড়ের সাজ
দীনু ঘোষ হবে ব্যাঙ্‌খাগী মনসা,
বাছা বাছা লোক নিয়ে গড়িয়াছি দল,
দেশ-জোড়া নাম হবে আছে ভরসা॥

...WAT LIBRARY Estd. 1012

চাঁদ সদাগর সাজিবেন ভুলু বাবু
শেখাবেন সবে নিজে হয়ে মাস্‌টার,
শিব হবে ঐ ওপাড়ার ভুঁড়ো হাবু
কানাই দাসেরে করিব বেহালাদার॥

চ্যাংড়ারা সব সখীদের গান গা,
নেতা ধোপানীর সাজ আমি দিব আর,
মালিনীর গান আমিই গাহিব একা
তাল্ কেটো নাকো তবলচী হুঁসিয়ার॥

ঘুঙুর পায়েতে নাচ তোরা সবে শেখ,
হইবে আসর নাচে ও গানেতে মাৎ,
এই দাড়িমুখে এমন্ সাজিব সং
রসিকে কহিবে বাহা বাহা কেয়াবাৎ।

কেঁদে কেঁদে গান গাহিবে বেহুলা সতী,
মেগে লবে সতী মরা সোয়ামীর জান্,
লখিনেরে নিয়ে গাঙুড়ে ভাসাবে ভেলা
চাঁদ দিবে নাকো মনসাদেবীরে মান ॥

এ সতীর দেশে গাবো সতীমার জয়,
চাঁদের নিষ্ঠা বিলাইব ঘরে ঘরে,
সতীর পুণ্যে মরা পতি প্রাণ পায়
এমন কাহিনী কে শুনেছে চরাচরে !

সাঁতালী-পাহাড়ে লোহার বাসরঘরে,
বেহুলা কাঁদিবে সোয়ামী লইয়া কোলে,
বিধবা হবে না চাঁদের বেটার বউ,
ওদিকে মনসা হিংসায় রাগে ফোলে ॥”

মহা উৎসাহে চলে ভাসানের সায়
কল্কের মুখে তামাকের ধোঁয়া উড়ে,
সখীদের গান গায় ছেলেদের দল
বেহালার সাথে বাঁশীর মতন সুরে ॥

মাছগ্রামে বাড়ী লখাই জমাদ্দার *
সেবারে পূজোয় ভাসানের গান দিলো,
দলবল নিয়ে গাহেনী আমীন সা,
সামিয়ানা তলে আসর জাঁকিয়ে নিলো ॥

---

* ইনি মুসলমান হয়েও নিজের বাড়ীতে প্রতি বৎসর জোড়া দুর্গা প্রতিমা পূজা করাতেন।

উঠান ভরিয়া বসেছে হাজার লোক,
ঘরের দাওয়ায় বসেছে নারীর দল,
পুঁটুলী বাঁধিয়া আনিয়াছে পানগুয়া
পানগালে লাল ঠোঁটে হাসে খল্‌খল্‌ ॥

কেউ বলে—আজ রাঁধিয়াছি চচ্চড়ী,
কাঁচা তেঁতুলের খাসাচুকো অম্বোল,
কেউ ভেজেছিল সরাপিঠে খান কয়,
কেউ খেয়েছিল বড়ি ও কচুর ঝোল ॥

কারো ছেলে কাঁদে মুখে দিয়ে মার মাই,
কচি মেয়ে কারো ঘুমেতে নেতিয়ে পড়ে,
কোনো বুড়ি নিয়ে আঙুলে পাতার গুঁড়ো,
বাহির করিছে দাঁতগুলো নড়ব'ড়ে ॥

ঘোম্‌টা খুলিয়া বৌরা গল্পে মাতে,
মেয়েদের দলে গোলমাল হয় খুব,
চাদর গলায় দাঁড়ায়ে নিতাই রায়,
হেঁকে, বলে, "ওগো মা সকল চুপ্‌ চুপ্‌।"

আসরে বসেছে বহু চাষী ভদ্দোর
কাঁচা পাকা মাথা উঠান গিয়াছে ভরি,
চাষীরা বসেছে চাটাই বিছায়ে সবে,
কাঁধেতে গামছা, সবার হাতেই লড়ি।

আসরে ঝুলিছে লাল সামিয়ানা-তলে
টিনের দুইটি চার্‌'কোণা লন্ঠন্‌,
ঢোলকে বাজিল জম্‌কালো দম্বোল,
জুড়ি তালে তালে হাসিছে ঠনক্‌ ঠন্‌।



মহা উৎসাহে পালা হইয়াছে সুরু
আসরে নামিল অষ্ট সখীর দল,
ঘাগরা দোলায়ে কাঁচুলী উড়নী পরি
জরির টিক্‌লী চমকিছে ঝল্‌মল্‌।

সুরু হ'ল গান গণেশের বন্দনা,
সরস্বতী ও নারায়ণ শিব আদি,
সবাই বলিছে বাহা-বাহা, আহা-আহা,
ছড়ের টানেতে বেহালা উঠিছে কাঁদি ॥

আসিলেন শিব, মাথায় বৃহৎ জটা,
আসিল মনসা ভীষণা সাপের রাণী,
করিছে নালিশ—"চাঁদ সদাগর বলে—
মনসারে আমি দেবা ব'লে নাহি মানি !

হেন্তাল হাতে এলো চাঁদ সদাগর
বেহুলার বিয়ে দিবে লখিনের সাথে,
গণক ঠাকুর মাথা নেড়ে গ'ণে বলে—
সাপেতে কাটিবে লখিনে বিয়ের রাতে ॥

চম্পা নগরী কাঁদিয়া হইল সারা,
চম্পার চাঁদ কালো মেঘে গেল ঢেকে,
শত সাপুড়িয়া, রাজ্যের যত সাপ
খুঁজি বনে বনে মারিল চম্পা থেকে ॥

কপালের লেখা ফলিল বাসর ঘরে
মা-বাপের সাথে বেহুলা কাঁদিয়া সারা।
আসরের মাঝে হাজারো পুরুষ মেয়ে
সবার চোখেই বহিছে জলের ধারা।

ভেলায় লইয়া লখিনের মরা দেহ—
কপালে সিঁদুর, বেহুলা ভাসিয়া চলে,
করুণ কণ্ঠে স্বামীর জীবন মাগে,
সকল নারীর আঁচল ভিজিল জলে ॥

বেহুলার গানে বর দিলা ভোলানাথ,
স্বামীরে বাঁচায়ে হাসিমুখে ফেরে ঘরে
সিঁথির সিঁদুর, সতীর হাতের নোয়া—
হেরি দর্শকে জয় জয় রব করে ॥

রাত শেষ হলে ভাঙে ভাসানের পালা,
মেয়ে ও পুরুষ বাড়ী ফিরে দলে দলে,
সবার মুখেই বেহুলার গুণ গান
সবার প্রাণেই সতীর মহিমা জ্বলে।

হেন আনন্দ স্বর্গের আলো মাখা
সারা গাঁয়ে সারা কুটীরে বিরাজ করে,
কোথা তুমি আজ মরমী আমীন্ সা,
তোমারে স্মরিয়া চোখ আসে জলে ভ'রে।

---



সে বছর ভাদ্র মাসে   মাঠ যবে জলে ভাসে   ( রাম্নগিন্নি )

( শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে )




সে বছর ভাদ্র মাসে মাঠ যবে জলে ভাসে
আসিলেন রায়গিন্নী গাঁয়ে,
বছর পনেরো পরে কি জানি কি মনে ক'রে
সঙ্গে নিয়ে মাসতুত ভায়ে।

দেখিয়া তাঁহার বেশ মনে হ'ল বড় ক্লেশ,
ইনি দামোদর রায়-গৃহিণী,
যাঁহার রূপের ছটা সাজ-অলঙ্কার-ঘটা
দশখানি গাঁয়ে ছিল কাহিনী!

স্বামী দামোদর রায় ওকালতী ব্যবসায়
পাটনার সেরা বড়লোক যে,
দু'তিনটা করি পাশ ছাড়িলেন গ্রাম-বাস
বছর বিশেক আগে কথা সে।

গ্রামে বসি শুনিতাম দামোদর গুণগ্রাম—
ব্যাঙ্কে টাকা তেমহলা বাড়ী,
মেয়ে দেছে বড় ঘরে, —ছেলেরা চাকরী করে,
সহরেতে চড়ে হাওয়া-গাড়ী।



অবাক্ হইনু আমি দেখি রায়-ঠাকুরাণী
মলিন সে বিধবার বেশ;
চোখের কোণেতে কালি, কোথা সে রূপের ডালি,
অঙ্গে নাই আভিজাত্য-লেশ।

ছলছল আঁখি দুটি ঘাটের উপরে উঠি
চলিলেন বাবুদের বাড়ী ;
গ্রামশুদ্ধ ছেলেমেয়ে পিছে পিছে চলে ধেয়ে,
শুনিতে ব্যাপার তাড়াতাড়ি।

যেতে তাঁর চোখে পড়ে তাঁরি বাড়ী ঝোপেঝাড়ে
শেয়াল শুয়োরে বাঁধে বাসা ;
ধীরে দীর্ঘশ্বাস পড়ে পা যেন চলিতে নারে
হায় গ্রামে কি আশায় আসা !

আসিলেন দীনু ঘোষ, খুড়া যদুপতি বোস,
রমাবাবু বলে "এসো খুড়ী,
চোখে আজ দেখি কি যে পনর বছর মাঝে
এ কী বেশ, হয়ে গেছ

শুনিলাম সে কাহিনী কেঁদে কন ঠাকুরাণী,
"ধনজন লভিনু প্রচুর,
সহরে মানের দায়ে, বহু অর্থ বিকাইয়ে,
দুঃখ-কষ্ট করেছিনু দূর।

অট্টালিকা জুড়িগাড়ী, সর্ব্বস্ব লইল কাড়ি,
বহু ব্যয় মেয়ের বিবাহে—
সম্ভ্রান্ত বেহাই পেয়ে বড়লোকী চাল্ দিয়ে,
অর্থনাশ নানা সমারোহে।

ছেলেরা কলেজে পড়ে' শুধু সাহেবানা করে,
তবু তারা রহিল বেকার,
বিলাসে কুসঙ্গে পড়ি' এক ছেলে গেল ছাড়ি,
ঘরে দুইজন উমেদার।

কর্ত্তার হইল কাল, হয়ে গেল বান্‌চাল্—
আমার সে সোনার সংসার।
সাগর সমান দেনা, তে'মহলা বাড়ীখানা
সর্ব্বস্ব হইল ছারখার।

আত্মীয়-স্বজন যত দেখি মোর ভাগ্য হত,
বারেক ফিরিয়া নাহি চায়।
পাওনাদারেরা হায় রক্ত মোর চুষে খায়
কেউ নাহি চাহে করুণায়।

ঝোড়-জঙ্গলেতে ঘেরা গ্রাম ম্যালেরিয়া সারা
ঘৃণা হ'ত ভদ্রাসনে যেতে।
গ্রামের এ ভিটা ছাড়ি, ধনী হয়ে তাড়াতাড়ি
বিলাসেতে মত্ত সহরেতে।

সাত-পুরুষের ভিটে, সে মাটি কেমন মিঠে,
দারিদ্র্যে যা ছিল স্বর্গধাম।
খামার সে বিঘা ষাট, নীলু ঠাকুরের ঘাট,
আজো খ্যাত শ্বশুরের নাম।

দিনেকের তরে হায়, না এনু গ্রামের ছায়
না জুড়ানু পিপাসিত প্রাণ।
ডাকিতেন পল্লী-মায়, . আয় আয় কোলে আয়,
নাড়ী-ছেড়া পরাণের টান।

দীনু ঘোষে দিয়া ভার, বাড়ী-ঘর সে খামার,
ভাবি রক্ষা হ'ল পল্লীবাস।
খাজনার দায়ে হায়, দীনু সবি গিলে খায়
মোরে দিয়ে শুধু সর্ব্বনাশ।

পাটনায় আর নাই মাথা রাখিবার ঠাঁই
কাঁদিবারো ঠাঁইটুকু নাই।
এত বড় অবহেলা, মাকে নিয়ে ছেলেখেলা
মার কোলে আজি নাই ঠাঁই।

আজি আমি অভাগিনী, কাঁদিব যে একাকিনী,
পবিত্র শ্বশুর-ভিটা 'পরে।
তাও তো খেয়েছি শেষে, আর নাহি পাই দিশে
ফিরিলাম আশ্রয়ের তরে।"

নারী ভাসে অশ্রুজলে, কেঁদে জমিদার বলে—
"মাগো বড় ব্যথা বাজে প্রাণে।
পল্লী তোমা ভুলে নাই, গৃহহীনে দিবে ঠাঁই
আপন বক্ষের মাঝখানে।

গরীবেরি তরে গ্রাম সুখময় স্বর্গধাম
বড়লোকে করে অবহেলা।
বড় হ'লে ভুলে যায়, . সহরেতে ব'সে হায়
গ্রামে তার শৈশবের খেলা।

মা যদি দুখিনী হয়, অনাহারে প'ড়ে রয়,
তবু ছেলে ফিরে না তাকায়।
ধনী মানী সে কু-পুত্র, ছেঁড়ে মার স্নেহসূত্র
তবুও মা তারে ফিরে চায়ঃ

খুড়িরে দেখিয়া হায়, মোর বুক ফেটে যায়,
এ গ্রামের রায় পরিবার।
পল্লীসমাজের মণি, দেবতা সমান গণি
আনো ফিরে বুকে পল্লীমার ॥

শোনো দীনু, মোর কথা, বাঁচাইতে চাহ মাথা?
নিজের মঙ্গল চাও যদি—
ফিরি দিবে এঁর বাটী, রায়দের ভিঁটে-মাটি
বিশদিন সময় অবধি।

যদি নাহি দাও তুমি, রামেন্দ্র সান্যাল আমি
তোমারে করিব গ্রামছাড়া!
রায়-গিন্নী ঘর-দ্বার তুলিবার সব ভার
আমি লই মম অর্থ দ্বারা।

পল্লীস্বর্গে করি বাস, ধর্ম্মেরে করিলে নাশ
সরল সত্যেরে যাও ভুলি।
তোমাদেরি পাপে হায়, সুখশান্তি দূরে যায়—
লক্ষ্মীছাড়া হ'ল গ্রামগুলি।"

কাঁদি কয় দীনু ঘোষ, "বড় রবে আফ্‌শোস্‌
রায় বাড়ী নাহি দিই ফিরে।
প্রতিষ্ঠা করিব আমি, রায়লক্ষ্মী গৃহে আনি
দাও মাগো পদধুলি শিরে।"



# শিবু কীর্তনীয়া

শিবু সা'র গান হবে !

কাছারী-বাড়ীর কদমতলায় আসরে বসিল সবে ।
আমলাবাবুরা, পল্লী-নারীরা, পুরুষেরা দলে দলে
ভক্তি-প্রেমের গঙ্গায় নেয়ে বসে কদম্বতলে ।
দুই পাশে দুই খোলের বাইন্, পিছে দোহারের দল
কপালে তিলক, গায়ে নামাবলী শিবু প্রেমে ঢলঢল ;
মাথাভরা টাক, নধর কান্তি, গলে দোলে ফুলমালা,
কণ্ঠে জড়ানো চন্দনমালা, সভা করি রূপে আলা ;
হাঁটু গেড়ে ব'সে হাত জোড় করি ভক্ত সে শিবু সাহা
চেয়ে তার দিকে সভাজন যত মুখে বলে 'আহা আহা' !
খোল-করতালে গৌরচন্দ্রিকা আনন্দ হিল্লোলে,
বৃন্দাবনের সেই অপরূপ ছবিটি জাগায়ে তোলে ।

রবিবাবু মহাশয়,
এলেন আসরে হাসিমুখে সহ বান্ধব সদাশয়।
ম্যানেজারবাবু বামাচরণের ফুলমালা গলে পরি'
বাবু-মশায়ের বরবেশ নিলো সকলের মন হরি'।
রসে ডগমগ গাহে শিবু সাহা পদাবলী সুমধুর—
নেমে এলো আহা এই পল্লীতে সেই মধু ব্রজপুর।



পদাবলী কীর্ত্তন

ভক্ত শিবুর কণ্ঠে জাগালো নানা রস-আলাপন।
"জনম অবধি রূপ নেহারনু, না হ'ল দেখার শেষ",
কবিগুরু হায় বিভোর ভাবেতে ধেয়ানমুগ্ধ বেশ।
রসে ঢলঢল প্রেমে গর'গর' হৃদি মধু-ভাণ্ডার—
শিবু দিল আজ প্রেমিক কবিরে রাধাপ্রেম উপহার।

রাধার বিরহ জাগাইল হায় কবির বিরহী প্রাণে
মুগ্ধ কবির সজল দৃষ্টি চেয়ে রয় শিবু পানে।
কীর্ত্তন শেষ। আরো বহুবার পিপাসিত কবিবর—
অমিয়-কণ্ঠ ভক্ত শিবুরে করেছেন সমাদর।
তাঁরি আহ্বানে কত রাজসভা ভাসায়েছে প্রেমবানে,
জানিপুরবাসী শিবু সাহা জাগে শত ভকতের প্রাণে।
বৈষ্ণব শিবু না চাহিতে পেলো বাবু-মশায়ের দান
ভূসম্পত্তি গ্রামে, আর সারা দেশময় সম্মান।

সারাটি জীবন ধরি—
সারা বাংলার আকাশে বাতাসে প্রেমমধু দিল ভরি।
"গোরা গোরা" বলি' কাঁদে,—
যারে পায় তারে বুকে ধরি' হায়, বাহু আলিঙ্গি বাঁধে।
খোল-করতালে প্রেমের যমুনা ঢেউ লেগে বেগে ধায়,
"রাধে রাধে" বলি যারে পায় তার চরণ ধরিতে যায়।

কোথায় পাইলে তুমি—
ব্রজের কোকিলে কণ্ঠে তোমার, কেমনে পুষিলে শুনি?
ওগো মরমিয়া! মরমের ছবি বাহিরে দেখালে তুলি'
"বাহির দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর দুয়ার খুলি।"
ব্রজের যে প্রেম নহে সাধারণ, গোপন গোপিনী-প্রাণে
রসের রসিক, এমন করিয়া তারে কি বাহিরে আনে?

হাসো নাচো গাও, কাঁদিয়া ভাসাও, এ কেমন রীত্ তব ?
ঢাকের বাজনা মাঝারে বাজাও ব্রজের মুরলী-রব।
শুন গো রসিকরাজ !
বহু আস্বাদে অরুচি রসনা,—কি মধু বিলালে আজ !
তব কীর্ত্তনরসে ভাসি'—
কবিগুরু রবি মহাভাবে ভোর মুখেতে মধুর হাসি।
বিরলে বসিয়া পদাবলী সুধা তাঁহারে শুনালে গুণী,
মুগ্ধ করিলে রসসুধা স্রোতে সে রসিক-চূড়ামণি !
শোক ভুলে গেছে কত পিতামাতা শুনি' তব গোঠলীলা,
কত প্রেমিকের হৃদয় ছুলালে কুঞ্জে ঝুলন-খেলা !
তুমি কিগো ছিলে সেই দ্বাপরের কোনো এক ব্রজবাসী ?
ত্যাজেছিলে প্রাণ বিরহ-যাতনে কানাইয়েরে ভালোবাসি' ?
সে বিরহ তব চির অনন্ত,—জনমে জনমে রবে,
পীরিতির চির বিরহের জ্বালা অবসান হ'ল কবে ?
পীরিতি পরম ধন,
সারাটী বঙ্গে সে সুধা বিলায়ে রচিলে বৃন্দাবন।



# পাঁচী পাগ্‌লী

সখিপুর বাজারের বটগাছ-তলাতে
শুয়ে আছে পাগ্‌লী দুপুরের বেলাতে।
পাগ্‌লীর বারো মাস থাকবার স্থানটি,
কিবা শীত গ্রীষ্মে নিরালা এখানটি।
পাগ্‌লীর ভাঁড়-হাঁড়ি বটগাছ-কোটরে,
কাকদল ডালভাত খায় তাহা ঠোকরে।
গাছতলা চরে কত ছাগ আর ছাগ্‌লী,
খেতে দেয় বটপাতা তাহাদের পাগ্‌লী।
পাগ্‌লীর ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে যত কুকুরে
দৌড়িয়ে খেলা করে সেই ঠিক্ দুপুরে।
ও পাড়ার ল্যাজ-ফোলা দুটো হুলো বেড়ালে,
বটতলে ম্যাঁও ম্যাঁও ঝগড়াটা বাধালে।

"দূর দূর ছেই ছেই" হাঁকে পাঁচী পাগ্‌লী,
"দুপুরের ঘুম মোর তোরা ডেকে ভাংলি।"
গরুগুলি চরে' চরে' অশথের পাতা খায়,
পাগ্‌লী তাদের ডাকে "আয় আয়, বুধু আয়!"



ছেঁড়া কাঁথা শোঁকে যত নাল্‌কী বাছুরে,
শালিকেরা ঠোক্‌রায় তার ছেঁড়া মাদুরে।
দুইটি শেয়াল খায় গাছতলে বটফল,
খাঁ-খাঁ-করা রোদ্দুরে ডাকিছে ফটিক্‌জল।
বটপাতা ফল পড়ে, ঝির্‌-ঝিরে হাওয়া বয়;
মিটি-মিটি চায় পাঁচী, কভু চোখ বুঁজে রয়।

একদিন সেই পাঁচী ক্ষ্যাপা যেন মা কালী,
চলিতেছে রাস্তায় ছড়ায়ে ধুলো বালি।
পাছে তার লেগে আছে দুষ্টু ছেলের দল,
ক্ষ্যাপাইছে "এই পাঁচী, তোর গায়ে ঢালি জল।"
জল দেখে পাগ্‌লীর চিরকাল বড় ভয়,
চান্ করা অভ্যাস বারোমাস মোটে নয়।
গায়ের গন্ধে তার তিষ্ঠানো হয় ভার,
ডালভাত লেগে থাকে সারা গাল মুখে তার।
লুটিছে ধুলায় তার পরণের ন্যাকড়া,
পাগ্‌লী হাঁকিছে মুখে, "মর্ মর্ ড্যাক্‌রা।"
তবুও ক্ষ্যাপায় তারে দুষ্টু ছেলের পাল,
পাগ্‌লী ছড়ায় ধুলো, হরদম্ দেয় গাল।

পাগ্‌লীরে আজ বড় মেরেছে মাখন দাস,
ঝরিতেছে রক্ত দিয়ে কপালের পাশ।
তার নাকি রান্নার ঘরে ঢুকে রাত্রে,
সরাপিঠে খেয়েছে সে যত ছিল পাত্রে।
তাই আজ পাগ্‌লী বাড়াবাড়ি ক্ষেপেছে,
কেঁদে রেগে ব'কে ব'কে কালোয়ায় চলেছে।
রাস্তায় পড়েছে সে ছেলেদের পাল্লায়,
হাতে নিয়ে ঢিল এক ছোঁড়াদের পানে চায়।

ফিরিছেন ভট্‌চাজ কালীপূজো সারিয়ে,
পাগ্‌লী তাঁহারে ধরে একেবারে জড়িয়ে।
কেঁদে বলে, "দাদামশা, বাঁচাও গো আমারে,
ম'রে গেছি আজ আমি মাখনের প্রহারে।"
"ছাড়্ ছাড়্" যত বলে ভট্‌চাজ মহাশয়,
তত তাঁরে পাগ্‌লী জাপটিয়ে ধ'রে রয়।
ছেলেরা দাঁড়ায়ে দূরে দেখে সেই মজাটা,
হেসে মরে দুষ্টুর পাণ্ডা সে ভজাটা।
ভট্‌চাজদাদা বলে, "ওরে পাঁচী, ছেড়ে দে—"
পাঁচী বলে "পাজীদের খুব ক'রে মেরে দে।"
"তোরে আজ খেতে দেবো, মাখনেরে মার্‌বো;
দুষ্টু এ ছেলেদের কান কেটে ছাড়্‌বো।"
পাঁচী তাঁরে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পোল' উঠানে,
ঘেন্নায় ভট্‌চাজ চলিলেন সিনানে।

গিন্নী দিলেন তারে শাড়ী এক পাড় লাল,
পাগ্‌লী পরিল তাহা হেসে নিয়ে এক গাল।
ভট্‌চাজ-গিন্নী পেতে দিয়ে কলাপাত,
খেতে দিল যত্নে গরম সে ডাল ভাত।
"আহা তোর বড় দুখ", কেঁদে কন্ গিন্নী—
"ভগবান্ তোরে সুখ একেবারে দেন্ নি।"

পাঁচী হি-হি হেসে কয়, "বড় সুখ, বড় সুখ,
দেখ্ মাগো পোড়া কাঠ, এই বুক এই বুক।"
এই ব'লে এঁটো হাত ঘুকেতে সে চাপ্ড়ায়,
খাওয়া ফেলে পাগ্‌লী হাতমুখ কামড়ায়।
চুল ছেঁড়ে, কাঁদে আর ছিটায় সে এঁটো ভাত,
ভট্চাজ্ রেগে কন্—"বেটী বড় বজ্জাত্।"
"গোল্লায় যারে, মর্" বলি ছোটে উদ্দাম্,
ঝড়ের মতন ক্ষেপী চ'লে গেল ছেড়ে গ্রাম।

—বছরখানেক পরে সেই বটতলাতে,
দেখি পাঁচী খায় মেখে চিঁড়ে আর কলাতে।
সারা গায়ে ক্ষত তার, ঝরে পুঁজ রক্ত,
বুঝিনু এবার তার বাঁচা হবে শক্ত।
ম'রে গেল পাগ্‌লী, চার পাঁচ দিন পরে—
শেয়াল কুকুর কাক টানে তার ঠ্যাং ধরে'।
কয়জন ডোম এসে পরদিন সন্ধ্যায়
তার পচা দেহটারে ফেলে দিলো পদ্মায়।
ডোমের কাঁধেতে চ'ড়ে শ্মশানের মা কালী,
ভাসে পদ্মার ঢেউয়ে, ক'রে দিয়ে গাঁ খালি।

*        *        *        *

পাগ্‌লীর সব ছিলো,—সোনার সে সংসার,
পুড়ে গেছে সব তার হয়ে গেছে ছারখার।
নাই ছেলে মেয়ে স্বামী,—কে লইবে সন্ধান,
পাগ্‌লীর দুঃখের জীবনের অবসান।



# বুলাইদাদার চিঠি

সহরবাসী গো আমার চাকুরে ভাই !

দীর্ঘ বারোটি বছর গেল গো বাড়ীতে যে এসো নাই  
উঠিতে বসিতে বাড়ীর সকলে তোমার কথাটি বল্লে,  
দেড়শো টাকার হাকিম দেওর—বৌদি গরবে চলে।  
তোমাকে সে যে গো মানুষ করেছে এতটুকু বেলা থেকে,  
পড়ার লাগিয়া গহনা বেচেছে বাঁধানো শাঁখাটি রেখে।  
বিদ্বান ভাই, সখ করে তার বিবাহে করেছি ঋণ,  
লায়েক ভাইএর দৌলতে মোর এমন রবে না দিন।  
কোলে ক'রে তোর বধুরে আদরে বৌদি তুলিল ঘরে,  
কোন কাজ তারে করিতে দিতো না একটি দিনের তরে।  
লক্ষ্মণসম দেওর তাহার, লক্ষ্মীর মত বধু,  
তোদের আদরে ঝরিছে তাহার শুধু বুকভরা মধু।

দু'চার ছত্রে লিখিয়া কুশল তাহার খবর লও,
হাজার মাথার দিব্যি জেনেও বাড়ীমুখো নাহি হও।
আমার প্রাণের ভাই।
বারোটি বছর দেখেনি মু'খানি, মনে যে শান্তি নাই।

বড় গরবের আমার চাকুরে ভাই।
গত আশ্বিনে অসুখ বলিয়া এলে না,—বুঝিতে পাই।
কত আশ্বিন, কত বড়দিন, দীর্ঘ বছর বারো,
বাড়ীর মায়া কি পড়িল না মনে একদিন একবারো ?
বৌমা বা তোর অসুখ হ'লেও বাড়ীতে এলে কি দোষ ?
আমাদের কোন্ অপরাধে ভাই হয়েছ অসন্তোষ ?
তোমাদের তরে রয়েছে পড়িয়া দক্ষিণদ্বারী ঘর,
বৌদি তোমার নেপিয়া পুঁছিয়া সাজায় নিরন্তর।
ভালোবাসো ব'লে দেয়ালে রেখেছে কৃষ্ণরাধার পট,
নোংরা হইবে বলিয়া সে-ঘরে কারো যাওয়া দুর্ঘট।
ভালোবাসো বলে বেলফুলগাছে প্রত্যহ ঢালে জল,
লম্বা ছুটার সময় হলেই প্রণমে তুলসীতল—
হরিঠাকুরের দয়াতে এবারে আসিবেই হীরালাল,
ছোটবৌ এলে দুষ্টু বীণার টিপে দেবে দুটি গাল।
সেই ছোটবৌ হীরুরে কেড়েছে তাহার আঁচল থেকে,
পুরো একদিন তাহার সঙ্গে কথা কহিবে না রেগে।

আমার কাছে সে কাঁদিয়া জানায় মান অভিমান পালা,
আমার চোখেও জল ঝরে আর বুকমাঝে করে জ্বালা।
আমার স্নেহের ভাই!
বিশ বৎসর তোরে জানি আমি, আজ তোরে চিনি নাই!

একে বড়দিন সারা পৌষমাস, নানান্ রকম পিঠে,
বৌমার সাথে হীরু খাইলেই হইবে দ্বিগুণ মিঠে।
ছুটীতো আছেই ;—বড় উৎসাহে কিনি গুড় দুধ চিনি,
অভাবী ঘরেও যা বলে গিন্নী, তখনি যে আনি কিনি,
সরুচাকলী, গোকুল পিঠে আর ক্ষীরের চন্দ্রপুলি,
পাটীসাপ্টা, ক্ষীরের চুসী আর রসের মুখ্সামুলী ;
সুনিপুণ হাতে দুই তিন দিন রাখিয়া যতনে কত—
দেবতার ভোগে লাগিল না বলি প্রতিদিন আশাহত,
অশ্রু মিশায়ে পচা দুইখান মুখে দিয়ে অনুরোধে,
'অসুখেই হীরু আসিতে পারেনি'—বৌদি তোমার কাঁদে।
চিঠি লিখিবার তরে বড় জিদ্, না আসার হেতু কি ?
চিন্তিত মনে আমি প্রতিদিন চিঠি তোরে লিখেছি।

কাকা আনিবেই সাহেবের সাজ, আশা করে আছে ননী,
শ্বশুর-আলয় হইতে আসিয়া "কাকা কোথা" বলে মনি।
ননী প্রায়ই রাতে বায়না ধরে গো—কাকার কাছেতে শোবো,
দুষ্টু কাকারে একবার পেলে চিমৃটি কাটিয়া দোবো।

তোমার দেওয়া সে 'হাসিখুসী' বই পুরোনো কালিতে মাখা,
যত্নে রেখেছে, আরো বই নেবে কাকার পাইলে দেখা।
তারা যে তোমারে দেবতার মত ভাবে সাধনার ধন,
কাকা ও কাকীর মধুস্মৃতিগুলি ছেয়ে আছে শিশুমন।
বাড়ীর কৃষাণ তোমার আসার পথটি চাহিয়া রয়,
ছোটবাবু এলে ধুতি ও গামছা তাদের পাওনা হয়।
তব সহপাঠী নবীন শুধায়, হীরু কি পেয়েছে ছুটী ?
"এবারে পায়নি, আসিবে পূজায়" মিথ্যা বলি গো, ছুটী!—
হাকিমের ছুটী পাওয়া সোজা নয়, অডার হওয়া তো চাই,
বিশেষ, এবারে ডেপুটী হবার চেষ্টা করিছে ভাই।"
হাঁ করে সবাই শোনে আর ভাবে, আমি কী ভাগ্যবান!
শুনে সব কথা হরিদা তোমারে আশীষ করিয়া যান্।

আমার বংশপ্রদীপ ভাই!
দশখানা চিঠি লিখিবার পরে তোমার পত্র পাই!
ভালো যে বাসিতে পাকাকলা আর রোপা ধান্যের চিড়া
গরুর দুধের ক্ষীরছক্ক ও এলাচ্-মাখানো পেড়া,
বড় অভাবেও তাইতে বেচি না ক্ষেতের বড়োন্ ধান,
ক্ষীরের লাগিয়া মুংলীর দুধ গিন্নী নাহিক খান্।
হরির দয়ায় কটি ছেলেমেয়ে, তবু দেবরের স্নেহ,
রক্তের সাথে রয়েছে মিশিয়া তাহার সকল দেহ।

পার্শেল করি ফি বারে পাঠাই মধুচুস্‌কির আম,
কেমন লাগিল, দুটি ছত্রেও লিখিতেও তাহা বাম !
তোমার জন্য ধন্য হয়েছে গ্রাম্য এ পরিবার,
কুলের প্রদীপ শিক্ষিত ভাই, মোদের অহঙ্কার !
তাইতে তোমার পূজা-উন্মুখ এই গরীবের বাড়ী,
আছো তো সুখেই বিদেশেতে ভাই এই স্নেহমায়া ছাড়ি !
সারা গ্রাম কহে, কুলের প্রদীপ মোর ভাই হীরালাল।—
দশ হাত বুক কেঁপে ওঠে মোর, উন্নত হয় ভাল !
তাই বলে কি গো ঘৃণা করো মোরে সহোদর বড়ভাই,
দাদা না খাওয়ালে ভরিত না পেট, সে কথা কি মনে নাই ?
মায়ের পেটের ভাই !
দেখি নাই মুখ বারোটি বছর, কোন কাজে মন নাই।

আমার প্রবাসী ভাই !
কী যে ভাবি আমি, হু হু করে মন গৃহ-সংসারে নাই।
যেদিকে তাকাই মনে হয় খালি, এই ঘর সংসার,
এত আছে মোর, তবু তোরি লাগি প্রাণ করে হাহাকার।
আমি মরে গেলে—পৈতৃক বাড়ী পুণ্যস্মৃতিতে মাখা,
কা'র হাতে সঁপে দিয়ে যাবো ভাই, তোর যে পাইনে দেখা ?
আসিও তখন, রাখিও যতনে বাপ পিতামহ নাম,
মূর্খ গ্রাম্য অকেজো দাদার পূরিবে মনস্কাম !

জননী-সমান বৌদিরে তোর দিস্ একমুঠো ভাত,
সাজায়েছে তোর গৃহসংসার তাহারই নিপুণ হাত।
তাহারই হাতের নিকানো সাজানো কাঁচা ঘরে একদিন,
দয়াল শ্রীহরি চরণ মেলিয়া হইবেন সমাসীন!



অতি বিশ্বাসী অন্ধ সেবিকা এই যে পল্লীনারী,
সাগর-প্রমাণ মমতা বুকেতে, তৃষ্ণার যাচে বারি।
মোর সহোদর ভাই!
এ জীবনে মোর তোমাদের কাছে কোনই কামনা নাই?




গোপীযন্ত্র বাজিয়ে কে গো ঠিক্ দুপুরের বেলা,
যষ্ঠি জেলের বাড়ীর উপর গানের করে খেলা।
স্তব্ধ দুপুর। গেরস্তেরা শেষ করেছে খাওয়া—
খাচ্ছে সবাই তামাক পান ব'সে ঘরের দাওয়া।
এমন সময় বাউলস্থরে উদাস হাওয়ার সনে
উঠ্‌লো কেঁপে বসাকপাড়া গানের মূর্চ্ছনে।
দেখি, জনেক সাঁই দরদী আলখেল্লা গায়ে
গোপীযন্ত্র সহযোগে গাইছে গাছের ছায়ে।
কাঁধে তাহার কাঁথার ঝোলা, একটি ছোট হুঁকো,
কুচ্‌কুচে তার বাঁকা লাঠি হাতল সর্পমুখো।
মাথায় তাহার চুলের ঝুটি, মুখে লম্বা দাড়ি,
চুলদাড়িতেই মুখখানি তার করছে কাড়াকাড়ি।

রংটা তাহার বেজায় কালো, চোখদুটি তার লাল,
"রাখাল-ফোঁটা" আঁকা তাহার ছোট্ট সে কপাল।

গাইছে ফকির, চোখদুটোতে ঝর্‌ছে কেবল জল,
সুরের পাখী কণ্ঠে তাহার কাঁদ্‌ছে রে চঞ্চল।
নাড়্‌ছে মাথা তালে তালে, শরীর হেলে দোলে,
গোপীযন্ত্রে হাতখানি তার নাচ্‌ছে মধুর বোলে।
শ্রোতারা সব নানান্‌ পাড়ার কয়টি পুরুষ-মেয়ে,
সভা করে শুন্‌ছে সে গান ভক্তিগাঙে নেয়ে।
তাদের মধ্যে একটি শ্রোতা—চক্ষে জলের ধারা,
লালন সাঁইএর গানের রসে প্রেমে আত্মহারা।
মুখে তাহার চাপ্‌দাড়ী আর পাগ্ঠীচাদর গায়,
গৌরবরণ কান্তি তাহার অঙ্গে উছলায়।

চিন্‌লো সবাই, সে মানুষটি গগনচন্দ্র দাম,
নানান রসের গান গেয়ে যে মাতিয়েছিল গ্রাম।
এতদ্দেশের সাধু, গুণী, খ্যাপা, বাউল যত
সাঁইজী-জ্ঞানে শ্রদ্ধা তারে করত বিধিমত।
ফকির তারে দেখে বলে—"ওগো গুরু সাঁই,
তোমার কাছে গাইবো যে গান হেন সাধ্য নাই।
গোপীযন্ত্র তোমার পায়ে এই রাখিলাম আমি
তোমার যে গান ওগো রসিক, স্বর্গসুধা মানি।

সেই রসেরি একটুকু আজ পাবার ভাগ্য হ'ল।"
গগন তারে আলিঙ্গিয়া যন্ত্র তুলে নিলো।
চক্ষু বুজে প্রণাম ক'রে সুরটি নিয়ে বেঁধে,
একটু কেশে রাগরাগিনী একটু নিয়ে সেধে,
কণ্ঠ তাহার উচ্ছ্বসিল প্রবল ঝরণাধারে—
"আমার মনের মানুষ যেরে
(আমি) কোথায় পাবো তারে।"
কখনো তার চক্ষু হ'তে গড়ায় মুক্তামালা
গলায় যেন আট্‌কে আছে বুকের সকল জ্বালা।
কখনো বা আনন্দগান জ্যোৎস্নারাতের মত
নির্বিচারে ছড়িয়ে দিলো প্রাণের প্রেমামৃত।
"কোথায় গো সাঁই, কোথায় দয়াল, কোথায় মনচোর?
বন্দী ছিলে পীরিতঘরে, মুক্তি দিলাম তোর।
ছড়িয়ে দে রে, বিলিয়ে দে রে আমার ভালোবাসা,
সারা জগৎ আমার প্রাণে করুক্ যাওয়া-আসা।"
প্রসারিয়া আনন্দলোক জাত-বেজাতের কাছে
রসলোকের মর্ম্মবাণী এরাই গাহিয়াছে।

গগন ছিল শিলাইদহের পোষ্টাপিসের পিওন,
চিঠি বিলির সঙ্গে চল্‌তো গানের আলাপন।
পোষ্টাপিসের ঝোলা নিয়ে কল্যাণপুর মাঠে,
ফির্‌তো যখন বিলিয়ে চিঠি, সূর্য্য যেতো পাটে।

বিজন মাঠে কণ্ঠ তাহার ছুট্‌তো স্বর্গপানে,
ফিরতো গাঁয়ে গগন যখন সন্ধ্যা-আঁধার নামে
গভীর রাতে তন্দ্রা-অলস নীরব অন্ধকারে।
গগন তাহার "হৃদয়শশী" দেখ্‌তো নয়ন ভ'রে



সময় পেলেই গান বাঁধ্‌তো, গুনগুনিয়ে গেতো,
হৃদয়ে তার কানায় কানায় জম্‌তো প্রেমামৃত।
রবিবাবুর বোটে প্রায়ই ডাক পড়তো তার,
রসিক দিতো রসরাজে প্রাণের গীতিহার।
মধুকণ্ঠ ভাবুক কবি গগন হরকরা—
খ্যাতি রট্‌লো তখন থেকেই সকল দেশজোড়া

দধিমাষ্টার, জদ্দারমশাই ডাকতো গগনেরে,
কবির লড়াই হবে, তাহার গান বাঁধিবার তরে।
রসের রসিক গগন নাহি মিশ্‌তো কবির দল,
বল্‌তো—"বাবু, মিছে তর্কে নাইকো কোন ফল।"
গগন বড় বাস্‌তো ভালো "সখীসংবাদ" গান,
মাঝে মাঝে আখর দিয়ে তুল্‌তো মধুর তান।
শ্যামবাবুদের মহোৎসাহের থিয়েটারের দলে,
গগনেরো ডাক পড়্‌লো গান শেখাবে ব'লে।
আসরেতে সমারোহে "প্রহ্লাদ-চরিত" পালা,
গগনের গান ঝঙ্কারিল সখের নাট্যশালা।
গগন নিল রঙ্গমঞ্চে 'নরসিংহের' সাজ
সেদিনকার সেই অভিনয় কেউ ভোলেনি আজ।
জোছনারাতে বোটের ছাদে বসে কবিগুরু,
গগন-সাথে নানান রসের আলাপ হত স্থুরু।
বাবুমশাই গান গাইতে করতেন অনুরোধ।
কণ্ঠ তাহার কোনো সময় কেউ করেনি রোধ।
কয়েক বিঘা জমি দিয়ে গুণীর সমাদর।
গরীব কবির করেছিলেন শ্রদ্ধা বহুতর।

কবে গগন চলে গেল মহাকালের ডাকে,
কেউ লেখেনি অবহেলায় স্মরণ ক'রে তাকে।

পল্লীকবি, রসিক, ভাবুক, দরদভরা-প্রাণ !
তোমার কথা কেউ বলে না, কেউ করে না গান !
রাজধানীর সভামঞ্চে উজল রংমহলে,
এ কবিরে কেউ ডাকেনি, দ্যায়নি মালা গলে ।
কোন্ দূরে এই পল্লীকুঞ্জে তাহার প্রাণের গান,
নদীর বুকে নীলাকাশে হারিয়ে গেছে তান ।
কেউ রাখেনি একটু স্মৃতি ; চরছে ভিটেয় ঘুঘু,
গ্রামের প্রান্তে তাহার বাড়ী ক'রছে আজি ধূ ধূ ।




অগ্রাণের সেই শীতের ভোরের বেলায়,
গোয়ালপাড়ার আমবাগান আর আখের খেতের পথে
সর্ব্বখেপী যাচ্ছে যেন কোথায় !
কী কাজে বা এ্যাত ভোরে কোথায় খেপী যায় ?
আপন মনে আপনভোলা খঞ্জনী বাজায়,
—আবার গুন্‌গুনিয়ে গায় ।
শীতের সোনার রৌদ্রটুকু ক্ষেতের আলে শিশিরভেজা ঘাসে,
ঘুমটি ভেঙে তখন সবে হাসে,
মাঠের আলের কল্‌মী ফুলের সজল চোখের তারা-
বিন্যাঝোপের আশে পাশে লতিয়ে ধরে' তারে
ভোরের আলোর প্রথম উচ্ছ্বাসে
শিশুর মতন খল্‌খলিয়ে হাসে !

সর্ব্বখেপীর পরণে গেরুয়া শাড়ী,
স্থূল দেহ তার চায় না কোনই বাঁধন—
শাড়ীর সাথে যেন তাহার আড়ি।
কপালে তার রসকলির ছাপা,
গলায় দোলে ফুলের সাথে চন্দনেরি মালা,
মাথায় চুলের চূড়া-বাঁধা খোপা।
হাটুর নীচে কাপড় সবই ভিজে,
পা অবধি জল কাদা আর বালি কতই কি যে।
চ'লেছে সে একমনে গান গেয়ে—
ছড়িয়ে দিয়ে সারা মাঠে তাহার বুকের বন্দী আনন্দেরে—
মিঠে রোদকে আরো মিঠে করে—
আপন মনে খঞ্জনী বাজিয়ে।

"গৌর গৌর গৌর আমার নাচে—
এই নদীয়ার পথে পথে দীন-কাঙালের গলা ধরি
হরিনাম সে সবার কাছে যাচে।"
—এই গানে তার হাতের খঞ্জনী
বাদলদিনের ধারার মতন কখন মৃদু কখন গভীর স্বরে
কণ্ঠে বাজে করুণ গুঞ্জনি'।
চল্‌ছে হেঁটে জীবন্ত এক ভক্তিমাখা গান,
ভোরের হাওয়ায় সঞ্চারিছে প্রাণ।

বুঝতে পেলাম, যাচ্ছে খেপী রবিবাবুর কাছে,
মাঠের পারেই কুঠীবাড়ী—বাবুর দোতালায়,
সেথায় ছিল খেপীর অবাধ গতি
চাকর মালির পাহারাতেও ম্যানেজারের কড়া হুকুম ঠেলে,
দারোয়ানরা দেয় না বাধা তায়।
বাবুমশা'র সঙ্গে গল্প করে—
গান শোনায় আর তাঁহার গলায় দোলায় ফুলের মালা ;
ফুল নিয়ে যায় আঁচলখানি ভ'রে।
সেই আমাদের সর্ব্বখেপী নয়কো সাধারণ—
বাবুমশা'র সঙ্গে যাহার কথা!
মান-সম্ভ্রম যথেষ্ট তাই খেপীর ছিল গ্রামে
কিন্তু খেপী ঘুরতো যথা তথা।
ভক্তি তারে করতো খুবই বৈরাগী-বোষ্টমে,
শুন্‌তো তাহার সরল তত্ত্ব কথা।
সাধারণে ডাক্‌তো তারে 'মা গোঁসাই' বা 'মা ঠাকরুণ' ব'লে,
পেয়ে তারে প্রাণের অন্তরঙ্গ।
ভদ্রলোকে ভাব্‌তো তারে ভণ্ড তপস্বিনী,
ভক্তি-বিটেল্ বুজ্‌রুকী সব অসহ্য তাদের,
করতো ঘৃণা খ্যাপাখেপীর সঙ্গ।

বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতে গোপনে
এক দুপুরে গেলাম খেপীর বাড়ী।

দেখি, খেপী লাউএর ডগা পাড়ে,
আমায় দেখে বস্‌লো তাড়াতাড়ি।
"লাউ নিয়ে যা, মাকে বলিস্‌, রাঁধবে লাউএর ঝাল
বড়ির সাথে দিয়ে মটরসুঁটী।"
এই ব'লে সে দিলো আমায় কাঠায় ক'রে চিড়ের মোয়া,
নাড়ুর সাথে মুড়কী কয়েক-মুটি।
জিজ্ঞাসিনু "খেপীদিদি, তুমি বড় সহজ লোক তো নও,
বাবুমশা'র সঙ্গে গল্প করো,
বাবুমশা'র বোটের উপর, কুঠীবাড়ীর দোতালাতেও যাও,
তোমার মান তো নয়কো অল্পতরো!
তুমি শোনাও কীর্ত্তন, আর তিনি লেখেন পদ্য বুঝি,
সত্য কথা বল্‌ তো খেপীদিদি!"—
"সে-সব তোরা বুঝবি নাকো, আমার গোরার কতশতো কথা,
গোরা আমার সকল গুণের নিধি।"
সকলভোলা হাসিটি তার চাঁদের আলোর মতই চমৎকার,
হাসিমাখা কয়টি কথা বুঝলাম নাকো একটুকুও,
মুখের পানে রইনু চেয়ে তার।

চোখে গড়ায় জলের বিন্দু,
তাহার সাথে ঠোঁট-দু'খানায় মিশিয়ে মধুর হাসি
বল্‌লে খেপী "ওরে আমার গোপাল,
ওরে কালা, আমি তোদের বড্ড ভালোবাসি।

আমার কাছে এসো মাণিক, এসো আমার সোনা”,
এই ব'লে সে দুহাত দিয়ে মুখটি বুকে ধরে
আমার গালে দিলো একটা চুমা।
—অবাক আমি, পালিয়ে গেলাম ছুটে—
কাণ্ড দেখে পেয়ে বড়ই ভয়।
মনে হ'ল, মিথ্যা তাহার রটেছে দুর্নাম,
খেপী আদৌ লোকটা খারাপ নয়।
গৌররূপের আকর্ষণে যে যায় নিত্য মাঠ পেরিয়ে
কুঠীবাড়ী রবিবাবুর কাছে,
তাঁহার পায়ে ফুল ছুঁইয়ে প্রসাদ ক'রে নেয়;
তার মরমী প্রাণের ঠাকুর নিত্য দেখে আসে,
আত্মারই চৈতন্য তার মনটি ভরে আছে।
সহজ মানুষ, সহজ প্রাণে সরলভাবে খেপী
ভগবানের সত্যমূর্ত্তি দেখতো দিবারাতি,
সবার উপর মানুষ বড়, সেই মানুষের লোভে
সারা জগৎ খুঁজতো আতিপাঁতি।
হয়তো খেপী পেয়েছিল সত্যসুন্দরেরে
এই গ্রামে এক প্রেমিক কবির মাঝে,
তারি নেশায় যখন তখন ছুটতো কুঠীবাড়ী
আপনভোলা অর্থবিহীন কাজে।
জানি না তার মনের গহন বনে
কাহার বাঁশী গুঞ্জরিয়া বাজে।

এই গ্রামে সে ছিলো একাকিনী।
কোন্ দেবতার প্রসাদী ফুল জোয়ারজলে ভেসে
এই গ্রামের এই নদীর কূলে সে কোন্ সন্ধ্যাবেলা
স্রোতের টানে ভিড়্‌লো নাহি জানি।
একটুখানি বাস্‌লো যারা ভালো
তারাই তাকে কুড়িয়ে নিলো ঘরে,



মুল্যবিহীন অনাবশ্যক ঠাকুরপূজার একটি বাসি ফুল—
দুদিন পরে ফেল্‌লো অনাদরে।
তার হৃদয়ের গন্ধরাশি বিলিয়ে গেল আঁধার নিবিড় বনে
ফুরিয়ে গেল কোন্ সে দিগন্তরে।

*           *           *

সর্ব্বখেপী গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরতো অনেক দূরে,
সাধুসেবায় মহোৎসবে কয়া, শ্রীকোল, চড়ুইখোলে,
পদ্মাপারের কুরী এবং নমশূদ্রের বাড়ী,
কখনো বা চ'লে যেতো খোক্‌সা-জানিপুরে।
যাত্রীবিহীন চ'লল ভেসে শূন্য তরণী—
কবে কোন্ এক আঁধাররাতে কোন্ অজানায় হ'ল নিরুদ্দেশ,
কোন্ সাগরের আকুল কলধ্বনি
তার দেবতার গাইলো আগমনী।

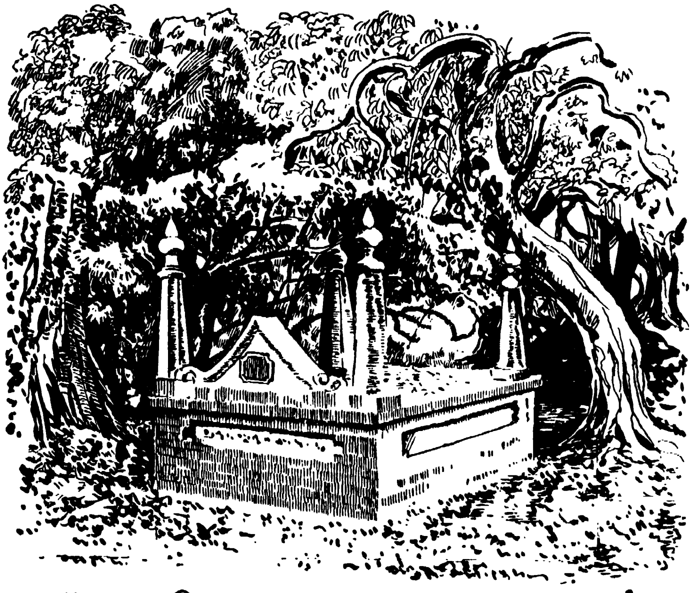
———



# দরগাতলায়

কোথা যাও, হেথা দাঁড়াও পান্থ,
বারেক হেথায় বসো,
ওগো মুসাফির, হাজি ও ফকির—
ওগো দরবেশ, এসো।
ওগো মৌলবী, ওগো মৌলানা,
এস গো আলেম, এস দেওয়ানা,
বহু তীর্থের ভ্রমণে ক্লান্ত
শ্রান্তির ঘাম মোছো।
শত বর্ষের বৃদ্ধ বটের
ছায়ায় এখানে বসো।

হেথা ঝিরঝিরে শীতল বাতাস
পাতায় পাতায় নাচে,
পাকা বুড়ো বট, নীম, দেবদারু
বাহু বাড়াইয়া আছে।



খোদার মোমিন্ হেথা ঘুমায়েছে,
বনতরুদল ঘিরি দাঁড়ায়েছে,
পাতার চামরে করিছে বীজন
চুপ্‌টি দাঁড়ায়ে কাছে।
পীর ফকিরের ভাষাহীন বাণী
যুগে যুগে শুনিয়াছে—।

সাধু-খোরসেদ্-পুণ্যবিতানে
গ্রামের সকল পাখী—
ভোর হতে রাত নানান্ সুরেতে
গাহে সবে থাকি-থাকি।
গাহিছে দোয়েল সকরুণ ধীর—
"ঘুমাও ঘুমাও ওগো সাধুপীর,"
শিশুকণ্ঠের আধো আধো সুরে
শালিকেরা ওঠে ডাকি,
ঘুমপাড়ানিয়া সুরে মৌমাছি
তন্দ্রায় রাখে ঢাকি।

ঐ বটতলে ঘুমায়ে আছেন
ঋষি পীর খোরসেদ্,
তাঁরি আস্তানা পুণ্য শীতল
আল্লারি মস্‌জেদ্।
দেখ নি তোমরা গভীর নিশীথে,
বিশ্ব যখন নিমগন নিদে,—
চুপিসাড়ে আসি নিজে খোদাতালা
করেন হেথায় খেদ।
আল্লা তো কভু সহিতে নারেন
মোমিনের বিচ্ছেদ।

অতি সুশীতল ছায়া যাদু-মাখা—
দরগাতলাটি ঘিরে
থরে থরে ভাঁটি ঝুম্‌কা জবায়
প্রজাপতি ঘোরে ফিরে।
সাধু খোরসেদ্ পূত আস্তানা,
হিঁদু মোস্‌লেম্ কারো নাই মানা,
মাটীর কবরে লুটায়ে যতনে
পূতধূলা মাখে শিরে,
কাঁচা দুধ চিনি সিন্নী মানতে
পূজে খোরসেদ্ পীরে।

তোমার খাদেম্ আজিরণ বিবি—
জমিরদ্দির প্রিয়া
শত দুঃখেও তোমারে সেবিল
কলিজার রং দিয়া।
তাহার সোয়ামী ঘুমালো কবরে
এই দরগারই দক্ষিণধারে,
জোয়ান্-মর্দ্দ ছেলেটিও গেল
সংসার আঁধারিয়া,
আজি-বিবি হেথা পড়িয়া থাকিত
জমাট অশ্রু নিয়া।

প্রতি সন্ধ্যায় চেরাগ জ্বালায়ে
হেথা সে নমাজ পড়িত,
প্রভাতে দরগা নিকায়ে যতনে
আশাসোটা মুছে রাখিত।
কাটাইয়া হেথা দিবা নিশীথিনী
গেল বেহেস্তে সেই পূজারিণী,
নীমগাছতলে লতাপাতা ঢাকা,
সে আজ কবরে শায়িত,
জোছনা-রাত্রে হুরী-পরীরাও
স্তবগান তার গাহিত।

গহীন রাত্রে অনেকে শুনিত
কান্না—"রে বাপজান্!"
চারিধার ঘেরা ঝোপেঝাড়ে কাঁদে
বুকফাটা সেই গান।
দরগাতলার কাঁদিত বাতাস,
মর্ম্মরি পাতা ফেলাইত শ্বাস,
আঁধার রাতের বুক চিরে চিরে
মিশে যেতো আস্‌মান্!
শুনিতেন আর কাঁদিতেন চুপে
আল্লা মেহেরবান!

* * * * *

বুড়ী আজিরণ জীবনের ইতিহাস
আজো রক্তের আখরে হেথায় লেখা,
সারা জীবনের বেদনাসাগর মথি'
অমৃতলোকের হেথায় পেয়েছে দেখা।

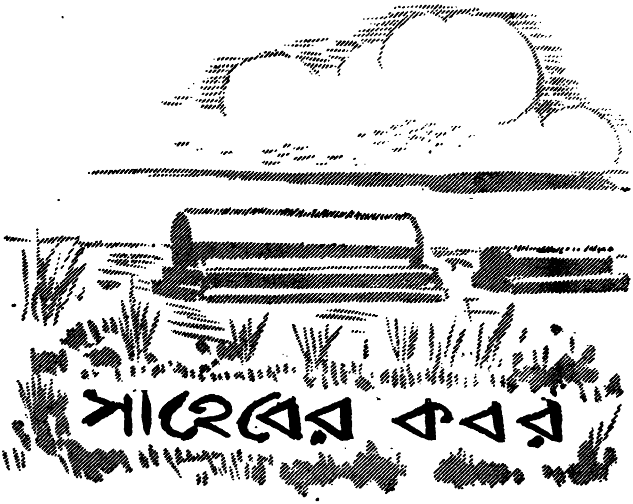
খোদার পায়েতে সঁপি আখেরের ভার
শান্তি লভেছে নীরব কামনা তার।
দেখিতে পাও যে মিটিমিটি জ্বলে
সন্ধ্যাপ্রদীপ শিখা,—
তারি জীবনের শোক-কালিমার
কপালে সোনার টিকা।

দরগাতলার আঁধার শীতল ছায়ে
বসো একবার যে হও সে হও, ভাই।
খোদার ইমান্ ঝরে মুরিদের গায়ে,
প্রাণ জুড়াবার এমন নাহিক ঠাঁই।

এই আস্তানা তিনশো বছর আগে,
পদ্মানদীর বুক চিরে উঠে জাগে,
খোরসেদ্ হেথা রচিলেন তপোবন,
অতীতের বাঁশী হেথায় শুনিতে পাই,
ছায়া স্নেহমাখা ঠাণ্ডা এ ভিজে মাটী,
হেথা এলে ঘুমে চোখ মুদে আসে তাই।

দরগাতলার দক্ষিণে ঐ গহন বনের মাঝে
কত না খাদেম কবরে ঘুমায়ে আছে।
মায়ের মতন আঁচলে রেখেছে ঢেকে
শ্যামল কুঞ্জে কত না গুল্ম-গাছে।
সারাদিন হেথা শেয়াল বেজিরা ঘুরে,
বাদুড় প্যাঁচারা ডাকে গম্ভীর সুরে,
এই ধ্যানলোকে সবে তপস্যারত
কথা কহিও না, ধ্যান ভেঙে যায় পাছে।
হেথায় তোমার প্রাণের দরদ নিয়ে
অতীতের গান শুন ইহাদের কাছে।

---



# সাহেবের কবর

সাহেবের নীলকুঠী
পদ্মার বুকে লুকায়েছে কোথা, কবর রয়েছে দু'টি।
কবরের নীচে সাহেব ও মেম্ পাশাপাশি ঘুম যায়,
আঁচলে বাতাস করে কত কাল দখিনা পূবাল্ বায়।
কুলু কুলু গায় দিনে রেতে গাঙ্ ঘুমপাড়ানিয়া গান,
ঠাণ্ডা নরম ঢেউয়ে নিরিবিলি জুড়াইয়া দেয় প্রাণ।
শিশিরের ধারা, রাতের চাঁদিনী কত যুগ ভালবেসে,
দেয় চুমু ওগো তোমাদের গায়ে কত যুগ কেঁদে হেসে।
তোমাদের বুকে কত ঝড় জল, কত বাদলের ধারা,
পোড়ায়েছে কত চৈত্রের খরা দুপুরে আগুন-পারা।
কত কাল হ'ল বিলাত হইতে এসেছ বাংলাদেশে,
অখ্যাত এই গাঁয়ের কিনারে ঘুমাইলে অবশেষে।

বড় নিরিবিলি শীতল বিছানা, ঘুমাও সাহেব-মেম্
কোথা হ'তে এসে কোথায় মিশালো তোমা দু'জনার প্রেম!
কোন্ গাঁয়ে এলে সাত সমুদ্র তেরো নদী হয়ে পার,
কোথা তোমাদের বাপ-মা রহিল, দেখিলে না চোখে আর।



আসিলে কোথায় স্বপ্নের দেশে বড়লোক হবে ব'লে,
সাত-রাজা-ধন মাণিক লইয়া স্বদেশে যাইবে চ'লে!
কত জমিদারী, লোক লস্কর, কত হাতী ঘোড়া গাড়ী
কত সাধ করি' গড়িলে এ গাঁয়ে রাজার মতন বাড়ী।
রাজার মতন প্রবল প্রতাপ সাদা চামড়ার জোরে
সব ফেলে আজ ঘুমাইছ হেথা জঙ্গলে ঢাকা গোরে!

তোমাদের দু'টি কবর দেখিয়া নীরবে শুধুই ভাবি,
পরলোকে থেকে এখনো ছাড়োনি এ জমিটুকুর দাবী।
বাপ-দাদারের আমল হইতে এ গাঁয়ের কত লোক,
এখানে নীরবে দাঁড়ায়ে করেছে তোমাদের তরে শোক।
এ গাঁয়ের কত লোক ম'রে পুড়ে হয়ে গেছে কবে ছাই,
কারা ছিল তারা, কিবা রেখে গেছে—কাহারও তো মনে নাই।
ওগো কুঠীয়াল্, যুগ যুগ ধ'রে এইখানে শুয়ে থেকে,
"এই যে আমরা হেথায়" বলেছ লক্ষ পথিকে ডেকে।

ভয় করি তোমাদের,
ওগো নীলকর, অত্যাচারের কাহিনী শুনেছি ঢের।
তোমরা সাহেব সভ্য স্বাধীন, বিদেশী রাজার জাতি,
রাজার ক্ষমতা পেয়ে সেই দিন ফুলালে বুকের ছাতি।
যাহা খুসী তাহা করেছ আরামে আমাদেরি বুকে ব'সে,
নীল চাষ করি লাখ্ লাখ্ টাকা আদায় করেছ ক'সে।
বাংলাদেশের কৃষক মজুর জবাই করেছ কত,
ছাগল ভেড়ার মতন, তবুও লোভ বেড়ে গেছে তত।
ঐ নীলকুঠী, পদ্মার বুকে লুকায়েছে আজ মুখ,
একদিন হেথা দাঁড়াইয়াছিল গরবে ফুলায়ে বুক।
ঘরে ঘরে তার চলিত আমোদ, নাচিত বিবিরা হেসে,
দিনের মতন হ'ত রাতগুলো আমোদে যাইত ভেসে।

কত রোস্‌নাই, হাসি গুল্‌জার, কত খানাপিনা ভোজ,
তোমরা গরীব প্রজারে ধরিয়া চাবুক মারিতে রোজ।
কেঁদে গড়াগড়ি যাইত প্রজারা হুজুরে দোহাই দিয়া,
রাখিতে তাদের শুকায়ে মরিতে চোরকুঠুরীতে নিয়া।

থাক্ থাক্, আর কহিব না ওগো হতভাগাদের কথা,
আজ ভুলে গেছি তোমাদের সেই দানবের ভীষণতা।
হও না তোমরা দৈত্য বা দানা, বিলিতি বেনিয়া লোক,
তোমরা মোদের প্রতিবেশী ভাই, আমরাই করি শোক।
পাপের কীর্ত্তি তোমাদের যত লুকাক্ গাঙের বুকে,
আমাদের এই সোনার গ্রামেতে ঘুমাও ঘুমাও সুখে।
এমন শান্তি সুখের নিদ্রা পেতে কি নিজের দেশে?
যারে মারিয়াছ, তারি বুকে আজ ঘুমাইতে হ'ল শেষে!
আমাদের মা যে গরীবের মাতা, সয়েছেন বহুতর;
পরের ছেলেও বুকে নিয়েছেন না বুঝে আত্মপর।
সাদা কালো নাহি রবে,
এক মার ছেলে সাহেব বাঙালী, এক হয়ে যাবো কবে!

---



# কেতু ঢালী

গাঁ'র বুড়োদের কাছে শুনিয়াছি যাদব ঢালীর গল্প,
ঢাল্-সড়্‌কীতে তাহার সমান পালোয়ান ছিল অল্প।
নাটোররাজের জমিদারী ছিল প্রাচীন শিলাইদহে
বরকন্দাজী করিত যাদব, আজিও বুড়োরা কহে।
দিঘাপতিয়ার সাথে নাটোরের জবর কাজিয়া হ'ল,
নাটোররাজের লেঠেলের সেরা যাদব লড়ায়ে ম'ল।
ঢাল বুকে নিয়ে রুখিত যাদব সড়্‌কীতে দিয়ে লাফ,
ডাকাতে' জিগির্ দাপটে সবার বুকে ধ'রে যেতো কাঁপ
ঢালখানা কভু মাথার উপরে কখনো বুকের 'পরে,
লম্বা সড়্‌কী লোহা দিয়ে গড়া ডানহাতে তার ধ'রে—
জবর্ জবর্ বহুৎ কাজিয়া যাদব করিল ফতে,
যাদব ঢালীর নামে ডাকাতেরা পলাইত গ্রাম হতে।

বহু লাঠিয়াল, বহু পালোয়ান ছিল তার সাকৃরেদ্
লাঠির জোরেই হইত সেকালে জমিজমা উচ্ছেদ।
ডাকাতেরো সর্দ্দার—
কহিত "যাদব আছে যে তলাটে, যাস্‌নে খবর্দ্দার।"

সেই যাদবের একটিমাত্র ছেলে এই কেতু ঢালী,
কন্যার সাথে বিয়ে দিল তার হরিবোলা ভুঁইমালী।
বাপের দোস্‌রা ছিল এই কেতু ওস্তাদ সর্দ্দার,
বরকন্দাজী পদেতে বহাল জমিদার সরকার
করিলেন, আর পাঁচ টাকা ক'রে বেতন হইল ধার্য্য,
খাকী কোট সহ চাপ্‌রাসে নিলো বরকন্দাজী কার্য্য।

জমিদারী মাঝে সফরে বাহির হ'লে মহর্ষিদেব,
পাল্‌কীর আগে ছোটে কেতু ঢালী ঝড়ের মতন বেগ।
ষোল বেহারার পাল্‌কী ছুটিত ছাড়িয়া কুমারখালী
মাঠ কাঁপাইয়া বন্দুক ছোঁড়ে আমাদের কেতু ঢালী।
আগে পাছে চলে মেছের, মাণিক, তারণ, মোহন সিং,
বেহারাদিগের স্থরে শোনা যেতো মৌমাছি ভিন্ ভিন্।
ডিহি কাচারীতে তাম্বু পড়িত, দাঁড়াইত কেতু দ্বারে,
নজরানা নিয়ে মাতব্বরেরা আসিতেন সারে সারে।
তাঁবুর দুয়ারে নায়েব আসিলে সম্ভ্রমে করি নতি—
"আস্থন বাবুজী"—বলিয়া দাঁড়াতো আদবমাফিক্ অতি।

বর্‌কন্দাজী আদব-কায়দা জমিদারী হাল্‌চাল্‌
কেতু সেপায়ের চলনে ফেরনে মাখা ছিল চিরকাল।
যাদব ঢালীর বেটা,
ঢাল্‌-সড়্‌কীতে হইয়া উঠিল একজন কেউ-কেটা।

পদ্মাবোটেতে সেবারে এলেন রবিবাবু মহাশয়,
সঙ্গে এলেন জগদীশ বোস, বিদ্বান কতিপয়।



কাচারীর মাঠে লাঠি-সড়্‌কী ও তলোয়ার খেলা হ'ল,
ওস্তাদ গুণী খেলোয়াড়দের ভিড় সেথা জমে' গেল।
বাজে ঢোল কাঁশী, ভাঁজে পাঁয়তারা সায়েরী লাঠির চাল্‌,
হয়ধর সাথে তলোয়ার খেলে কালোয়ার মধু মাল।

বেণী সর্দ্দার মাখন সিংএর ওস্তাদী লাঠিখেলা,
"সাবাস্ সাবাস্" হুঁসিয়ার রবে মুখর লোকের মেলা।
সড়্কীর খেলা হ'লে আরম্ভ, দাঁড়াইল কেতু ঢালী,
নানা কস্রতে সড়্কীর প্যাঁচ দেখাইয়া গেল খালি।
হুঙ্কারে বলে "কে আছ গুণীন্ ওস্তাদ সেরা দেশে,
যার যা ইচ্ছা হাতিয়ার নিয়ে রোখো এ আসরে এসে।
নামকরা বহু সেরা লাঠিয়াল এর ওর মুখে চায়,
ঢাল্ সড়্কীতে ওস্তাদ্ কেতু, জানে সারা দুনিয়ায়!
শেষে একজন অচের্না লেঠেল চেহারাতে পালোয়ান
কেতুর সাম্‌নে আসিল হস্তে 'আড়লাঠি' একখান।
"সাবাস্ দোস্ত, এগোও" বলিয়া বাদ্যের তালে তালে
নেচে নেচে কেতু হেটিয়া ক্রমশঃ কাঁপায়ে সড়্কী চালে।
নূতন লেঠেল্ দুই হাতে ধ'রে লম্বা সে লাঠিগাছ,
কেতুর মাথায় হাঁকে তার লাঠি ঘুরে ফিরে আগুপাছ।
ঢালের উপর ঠেকায়ে সে মার "সামাল্ সামাল্" ডাকি,
কেতু লাফ্ দিয়ে লেঠেলের পেটে সড়্কীর ফলা রাখি,
বুকে পায়ে তার সায়েরী মারের কায়দা দেখালো ক'টি,
মাটীতে সেলাম্ ঠুকিয়া লেঠেল বসিল খেলায় হটি।
মুখখানি হাসিমাখা,
বাবু-মহাশয় দিলেন কেতুরে বখ্‌শিস্ দশটাকা।

খাস্ বরকন্দাজ হ'ল কেতু বাবু-মশায়ের বোটে,
ছয় সাত মাস নানান্ খাতির কেতুর ভাগ্যে জোটে।
পতিসর আর সাহাজাদপুর, সেথা হ'তে কলিকাতা,
পাবনা, পাণ্ডি, জানিপুর আদি কুষ্টিয়া হেথা হোথা।
বাবু-মশায়ের সঙ্গে বেড়ায়ে কেতু ঢালী এলো দেশে,
চমক্ লাগালো কাপড়, চাদর, কোট্-প্যাণ্ট্ বক্‌শিসে।

চৈতপূজাকালে কেতু ফি বছর একমাস ছুটি নিতো,
'বালা সন্ন্যাসী' কেতু সেপাইএর নামে সবে হ'ত ভীত।
চতুর্দ্দশীর আঁধার রাত্রে "কাঁটাভাঙা" সন্ন্যাসী,
বধির ঢাকের বাদ্যে সে কেতু অসুরের মত আসি,
নাচিত যখন উঠান্ কাঁপায়ে সন্ন্যাসীদের সাথে,
আগুনের মাঝে খেলিত নাচিয়া চৌষট্ নিয়ে হাতে,
চৈত্র-মেলায় "কালাচাঁদ পাট" লইয়া মাথার 'পরে,
শিবের সেবক দৈত্যের মত নাচিত প্রলয় ঝড়ে,
মাথায় তাহার কাঁপিত সঘনে রুক্ষ চুলের জটা,
বুকের লোমে ও সারা গায়ে তার পিটুলীগোলার ফোঁটা,
মনে হ'ত যেন কালভৈরব ধরাতে উঠেছে জেগে,
শিব-তাণ্ডবে মত্ত মাতাল অধীর আকুল বেগে।

* * *

সে কেতু হয়েছে বুড়ো—
কয়েক বছরে হয়ে গেছে হায় জবুথবু থুত্থুড়ো!

বুড়ো কেতু আজ বাতেতে পঙ্গু, চলে লাঠি ধ'রে পথে,
বাজারেতে ব'সে পান বেচে আহা বেঁচে আছে কোনোমতে।
নাই সন্তান-সন্ততি কেউ,—আছে অতীতের স্মৃতি,
খায় দায় আর পানের বোঝাটি আনে সে বাজারে নিতি।
বীর কেতু ঢালী—কেতু সেপায়ের জীবনের অবসান,
ঠাকুর-বাবুর কাছারীতে পেতো পাঁচটাকা পেন্‌সান্।
কেতু ঢালী গেল মরে,'—
"ওস্তাদ্ গেল" ব'লে লেঠেলেরা হায় হায় সবে করে।

# সন্তোষপণ্ডিত



পণ্ডিত সন্তোষ রায়
বহুগুণে মণ্ডিত, শিশুগণ শঙ্কিত
নামে তাঁর শমনের প্রায়।
প্রকাণ্ড আটচালা কোলাহল-মুখরিত,
বসিয়াছে যেন মেছোহাট,
বিরাট ঐক্যতানে চলে সেথা সঙ্গীত—
—বোধোদয় আর চারুপাঠ।
গণ্ডা কড়া ও বুড়ি, সেরকিয়া পন্‌কিয়া—
ছেলেদের রকমারী স্বর,
পণ্ডিতমশায়ের বারোটায় আগমনে
পোড়োদের বুক দুরুদুর।

বেঞ্চিতে সারি সারি গোদা, ভোলা, নেড়া, হরি,
ভিজাবিড়ালের মত রূপ,
ঐক্যতানের শেষে বিয়োগান্ত অভিনয়
দেখিতে সবাই যেন চুপ।

সন্তোষ পণ্ডিত, মুখখানা মণ্ডিত
ইয়া গোঁফ, বুকছোঁয়া দাড়ি,
ইস্কুল-পালানো ছেলেদের নাম ডাকি
বলিলেন "ডাকো তাড়াতাড়ি!"
অঙ্কেতে অজ্ঞ, শঙ্কিত বেত-ভয়ে,
হরিপদ, জটা, নটবর,
কালিঝুলি মেখে হায়, আত্মগোপনে আছে
বিদ্যাধোপির ঢেঁকীঘর।

গণেশ, নারাণ, আদি যণ্ডা বালকদল
এবাড়ী ওবাড়ী খুঁজে ঘোরে,
ইস্কুল-উত্তরে বিদ্যার ঢেঁকীঘরে
পলাতকগণ ভেবে মরে।
ভাগ্যের দোষে হায় কখন আচম্বিতে
ঢেঁকিঘরে ঢুকিল জ্যোতিশ্,
ভুষিপোরা ডোল্‌মাঝে লুকাইল হরিপদ,
জটা, নটা কহে ফিস্‌ফিস্—

"পণ্ডিতে বোলো ভাই, জ্বরে মোরা শুয়ে আছি—
তোমাদের দিব চিলে-ঘুড়ি।"
গণেশাদি পাঠশালে হাসিমুখে ফিরে গেল,
ফুর্তিতে হাতে দিয়ে তুড়ি।

সন্তোষ পণ্ডিত শুনে ক'ন্ দুঃখিত—
"এসব ছেলেরা হবে গাধা,
গণ্ডমুর্খদের ভাগ্যেতে লেখা আছে—
সারাটি-জীবন শুধু কাঁদা।"
অঙ্ক আরম্ভিল উপরের শ্রেণীতে—
স্লেট্-পেন্সিলে খটাখট্,
কড়াক্রান্তি তিল নিয়ে বিব্রত ছেলেরা,—
উত্তর চাহি চটাপট্।
কেউ স্লেটে সাপ-ব্যাং এঁকে চায় ইতিউতি,
চোরাচোখে করিছে নকল,
বেত্রদণ্ড-ভয়ে সকলে সশঙ্কিত—
ভুল হ'লে অঙ্কের ফল।
দ্বিতীয় ভাগের বহু দাঁতভাঙা শব্দ
বানানে অনেকে গেল ঘেমে,
মুখস্থ না হইলেই পণ্ডিতমহাশয়
ঘুরালেন কান ধ'রে টেনে।

জিউলীডালের বেত্ত অনেকেরি ভাগ্যে,
কেউ হ'ল বেঞ্চিতে দাঁড়।
পণ্ডিত রেগে ক'ন—"গাধা উড়্‌বক্কের
পড়াতে কাহারও নাহি চাড়।"



পড়া না পারিয়া কেউ দুম্‌দাম্‌ মার খায়,
পৃষ্ঠে বুলায় দুখে হাত,
প্রথম ভাগের ক্লাসে ছেলেরা দেখিয়ে গেল
আঁজি 'ক-খ' লেখা কলাপাত।

বিজয়ী-বীরের মত বেঞ্চেতে ব'সে রয়
সুবোধ সুশীল যারা ছেলে।
বিদ্যার সাগরেতে ইহারাই পাড়ি দিবে—
লিখিয়া পড়িয়া অবহেলে।
কান্‌মলা মার্ খেয়ে ক'টি ধাড়ী ছেলে, হায়,
জুড়ে দিল ঘোর মড়াকান্না,
কচ্‌লিয়ে হাত বলে "পণ্ডিতমহাশয়,
পায়ে ধরি, মাপ করো,—আর না।"
পণ্ডিতমহাশয়, তাম্রকূটের লাগি—
পানের দোকানে যান পরে,
রামলাল পাল-ঘরে ক্লান্তি করেন দূর,
একগ্লাস জল পান ক'রে।

বিদ্যালয়ের সব গুরুদের মধ্যে
সুকঠোর সন্তোষ রায়,
ইস্কুলে হস্তে বেত্র-শোভিত তিনি,
প্রাণ ছিল ভরা করুণায়।
সতীশের জ্বর হ'ল, অজিতের আমাশা,
যান্ তিনি তাহাদের বাড়ী,
মাথায় বাতাস করি' শিওরে বসিয়া তিনি
হাত ধ'রে দেখিতেন নাড়ী।

পটোলপাতার রস, ভাঁটীর শিকড়-বাঁটা,
তুল্‌সীপাতার রস করি,
ভীত শিশু রোগীদের উপোষ করায়ে খুব,
খাওয়াতেন কালমেঘ বড়ি।
ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে অভিভাবকেরা তাঁর
করিতেন বহু সমাদর,
বিদেশী শিক্ষক বলি এ গ্রামের কোন লোক
কভু তাঁরে ভাবে নাই পর।
পাঠশালা-পণ্ডিত, অল্প-বিদ্যা ব'লে
কেহ তাঁরে করিত না হেলা,
গ্রামবাসী পণ্ডিত বিদ্বান সাথে তিনি—
করিতেন পাশা দাবা খেলা।
বাংলা কবিতা গান রচিতেন সুন্দর,
বিবাহের প্রীতি উপহার,
কবি-তর্‌জার সুরে মুখে মুখে ছড়া বেঁধে
করিতেন সভা গুল্‌জার।
"কবিরঞ্জন" বলি গ্রামবাসী পণ্ডিতে
গুণীনের বাড়াইল খ্যাতি,
আড্ডা ও মজলিসে সন্তোষ পণ্ডিত
রসভরে উঠিতেন মাতি।
অঙ্কে ও সাহিত্যে ছাত্রেরা সবে তাঁর
প্রায়ই হ'ত পাকা বিদ্বান।

রবিবাবু মহাশয় আসিলেই, বোটে তাঁর—
পণ্ডিত প্রণমিতে যান্।
কবির হাতের লাল মুকুতার মালা পরা—
খাতাখানা ছিল তাঁর প্রাণ।

বড়োদের দেখাদেখি স্কুলের ছেলেরা মিলি
বেঁধেছিল যাত্রার দল,
ভীম কীচকের রণে লালন নন্দী-বাড়ী
দুপুরে করিত টল্‌মল্!
বাখারীর তলোয়ার, তীর ধনুকের বোঝা,
খড়ে বাঁধা গদা বহুতর,
নানান্ রঙের জামা, কোষ্টার পরচুলা,—
সাজে জনে জনে বীরবর।
"আয়রে পাষণ্ড তুই, কর্ দেখি যুদ্ধ"—
বক্তৃতা-ঝড় বয়ে যায়।
ছুটীর দিনের সেই উদ্দাম আনন্দ
ফুরাইতে নাহি যেন চায়।
তুমুল যুদ্ধ বাধে, পতনে ও মূর্চ্ছায়,
বাজে খোকাচুনারীর ঢোল,
উৎসুক শ্রোতা সব এপাড়ার মেয়েছেলে
ভালোবাসে ছেলেদের গোল।

হায়রে, আচম্বিতে সন্তোষ পণ্ডিত
দাড়িমুখে করিলা প্রবেশ—
"হতভাগা, পাজী, গাধা, কান ধ'রে আজকেই
চাব্‌কিয়ে ক'রে দেব শেষ।"
অর্জ্জুন ভীম আদি দুর্জ্জয় বীরগণ
মহাবেগে করে পলায়ন,
নিস্তার তবু নাই, ইস্কুলে হবে এর—
সমুচিত বেত্রশাসন।
সোমবারে ইস্কুলে, প্রমথ, সুরেন, বুদে,
দেড় ঠ্যাঙে দাঁড়ায়ে রহিল,
যতীন, অভয়, কালী, অনন্ত, পাঁচু, হরি
দশ ঘা করিয়া বেত খেল।

জোত্‌দারদের বাড়ী থাকিতেন পণ্ডিত,
নীরোগ সবল তাঁর দেহ,
পূজাতে ও জ্যৈষ্ঠের ছুটীতে দুইটি মাস
লভিতেন স্বদেশের স্নেহ।
মানুষ তৈরী করা আজীবন ব্রত নিয়ে
পল্লীর গৃহে জ্বালি আলো,
বিনিময়ে কটি টাকা, তাতে মহা সন্তোষ—
জীবনে আঁধার জমে কালো।

জুড়িগাড়ী টাকা কড়ি, পাকাবাড়ী জোত জমা
পেলো তাঁর বহুতর ছাত্র,
জীবন-পাথেয় দিল নির্লোভ যেই গুরু,
প্রতিদান চাহিল না মাত্র।



# ঘর-জামাই

মাধবদাসের অবস্থা বেশ ভালো,

একটি মাত্র মেয়ে ছিলো তার

রংটি তাহার মেঘের বরণ কালো।

কালো হ'লেও সুবাসিনী অপ্‌রাজিতার মত

দখিন হাওয়ায় লতার গায়ে দুল্‌তো অবিরত।

কালো হ'লেও রূপটি তাহার লাগ্‌তো বড়ই মিঠে,

দুইটি ডাগর চোখের পাশে চুলের গোছা পিঠে।

মাধবদাসের মস্ত আড়ৎ ছিল কুঠীর হাটে,

ধান, চাল, গম, কোষ্টা, কলাই সারা বছর কাটে।

নৌকাবোঝাই চালান্ হ'ত নানান্ গঞ্জে মাল,

বস্তা বোঝাই মোষের গাড়ী আস্‌তো সাঁঝ-সকাল।

মা লক্ষ্মী বাঁধা ছিলেন মাধবদাসের ঘরে,

কিন্তু তবু একটি ছেলে জুট্‌লো না তাঁর বরে।

মেয়ে হ'তেই ছেলের সখ মিটায় মাধবদাস,
যোগ্য বরে দেবে বিয়ে এইটি তাহার আশ।
কিন্তু 'পচা কায়েত্' ব'লে, এম্নি কপাল তার,
যেমন তেমন একটা ছেলেও মেলাই হ'ল ভার।
শেষে মাধব পণ করল—রাখবে ঘর-জামাই।—
আদরিণী সুবাসিনীর অভাব কিছুর নাই ;
দাসমশাই মুদ্‌লে দু'চোখ জামাই সবই পাবে,
গোলাগঞ্জ জোত্‌জমা ধন জামাইয়ে বর্ত্তাবে।
এতেও কেহ ঘেন্না ক'রে বর হ'তে না চায়,
মেয়ের দেহে যৌবনেরি জোয়ার উছলায়।
মাধব ভেবে সারা—
সাগর-ছেঁচা একটি মাণিক করবে না ঘরছাড়া।

পাঁচু ছিল মাধবদাসের গোলার ওজনদার,
ভাই-বেরাদার ত্রিসংসারে কেউ ছিল না তার।
মাধবদাসের আশ্রিত সে খুল্‌না জেলায় বাড়ী,
ইস্টিমারের সারেং তারে গোলায় দিলো ছাড়ি',
সেই থেকে আজ বছর চারেক মাধবের সংসারে
গোবেচারী মানুষটি সে খাটছে এ কারবারে।
বিশ্বাসী সে, দীঘল গঠন, চেহারাটিও বেশ,
চাইলে বারেক তাহার দিকে দেখার না হয় শেষ।

মোকামগঞ্জ কোথায় কি দর, মুখস্ত তার সব,
মনিব-তুষ্টি কাজটি তাহার, নাইকো মুখে রব।
বেজায় তামাক খায় সে, ফাটায় কল্‌কে টানের জোরে ;
ছোট কল্‌কের নেশায় আবার বুনোপাড়ায় ঘোরে।
দুটি বেলা যায় সে খেতে দাসমশায়ের বাড়ী,
ফাই-ফরমাজ সেথাও থাকে নিত্যই রকমারী ঃ
দাস-গিন্নী ও সুবাসিনীর শাড়ী, সাবান, চুড়ি
কেনার তরে হাট-বাজারে তাহার ঘোরাঘুরি।
মনটি সাদা, গোব্যাচারী, সরল পঞ্চানন
খেটে-খুটে মুনিব-বাড়ীর জোগায় সবার মন।
সুবাসিনীর মনে
পাঁচুর মুখটি সদাই কেন জাগে অকারণে।

মাধবদাসে বল্‌ল সেদিন গ্রামের মাতব্বর,
"পঞ্চাননেই জামাই ক'রে রাখো নিজের ঘর।—
সৎকায়স্থ, সরল স্বভাব—তোমারই আশ্রিত,
বজায় রাখবে ব্যবসা তোমার কষ্ট-উপার্জ্জিত।"
মাধব এবং তার গিন্নীর মনে সায় দিলো,
ঘর-জামায়ে পঞ্চাননে বরণ ক'রে নিলো।
মেয়ের বিয়েয় মাধবচন্দ্র খবর করল ঢের,
হপ্তা ভ'রে ঘটা ক'রে মিট্‌লো বিয়ের জের।

* * * *

এদিক্ পাঁচু সিদ্ধি-গাঁজা নেশায় হ'ল দড়,
বোম্ ভোলানাথ পঞ্চাননের সময় নাইকো বড়।
বেলা হ'লেই গোলা ছেড়ে বুনোপাড়ায় জোটে,
ছিলিম্ পোড়ে, গাল-গল্পের মজার বাহার ছোটে।
দাসমশায়ের জামাই পাঁচু, সহজ কথা নয়,
আহার করতে আসেন যখন, অনেক বেলা হয়।



ভাত বেড়ে নে' ব'সে থাকে সুবাস শুকোমুখে,
স্নানের পরে তেড়ি কেটে পাঁচু তো খান সুখে।
আহার ক'রে পরিপাটি নাক ডাকিয়ে ঘুম,
পড়্‌লে বেলা, বিছানাতে উঠে' বসেন গুম্।
সুবাস খাওয়ায় তামাক সেজে, পাঁচুবাবু উঠে,
'বেলা গেল' ব'লে চলেন গোলার পানে ছুটে।

গোলায় ব'সে একটুখানি কর্ত্তাগিরি ক'রে,
গুটি গুটি চ'লে আসেন বিশুবুনোর ঘরে।
তামাক এবং সিদ্ধি-গাঁজার দারুণ ফুর্ত্তি চলে,
হাসির ধুমের অবসান রাত বারোটা হ'লে।
হেথায় ঘরে সুবাসিনী জেগে অনেক রাত
স্বামীর তরে আগ্‌লে' থাকে যত্নে বাড়া ভাত।
শয়ন-ঘরে পাঁচুর মুখে পত্নী-প্রেমের স্রোতে
সুবি'র প্রাণে মধুর জোয়ার বইতো স্বর্গ হ'তে।
এম্নি ক'রে বছর কাটে ;—কর্ত্তাগিন্নীর মনে,
ঘর-জামায়ের তরে দুঃখ বাজত সকল খনে।
মুখ ফুটে তা প্রকাশ তারা করত নাকো ভয়ে,
আদরিণী সুবাসিনীর সুখের বিনিময়ে।

*    *    *    *

কর্ত্তা গেলেন মারা,
দাসমশায়ের সংসারে হায় লক্ষ্মী হলেন ছাড়া।

নেশার তাগিদ ক্রমেই যখন উঠ্‌ল পাঁচুর বেড়ে
দাসমশায়ের আড়ৎ নিলো পাওনাদারে কেড়ে।
খামার জমি, লগ্নী টাকা, নগদ হাজার-ছয়,
গয়না-গাঁটি, বন্ধকী মাল ক্রমেই হ'ল ক্ষয়।
সুবাসিনীর চাঁদপানা দুইটি ছেলে হয়েছিল,
ভাগ্যদোষে গাঙের কূলে তারা শয্যা নিল।

পুত্র-শোকে সুবাসিনী ছাড়লো অন্ন-জল,
দাস-গিন্নীর হ'ল এখন মরণই মঙ্গল।
নেশায় বিভোর ঘর-জামায়ে গিন্নী বলেন দুখে,
"অলক্ষ্মী এ সংসারেতে বেশ্ তো আছো সুখে ;
গাঁজা-ভাংটা ছাড়ো বাপু, নইলে গেল সব।"
শুনে পাঁচু গর্জ্জে' উঠে ছাড়ল ভীষণ রব,
কুড়ুল শিরে শাশুড়ীরে মারতে ধেয়ে যায়,—
অশ্রুমুখী সুবাসিনী সম্মুখে দাঁড়ায়।
স্বামীর মুখের উপর রেখে অশ্রু-সজল চোখ
বলে, "আগে তোমার হাতে আমার মরণ হোক্ !
অ্যাতো দেখে-শুনেও তোমায় বাসি অ্যাতো ভালো—
আমার সোনার সংসারেতে তুমিই আগুন জ্বালো!"

মাস-তিনেকের মাঝে হ'ল দাস-গিন্নীর কাল,
পাঁচু এখন বাড়ীর ভিতর হাজির হামেহাল্।
মাথা-ঘোরার দারুণ ব্যামোয় পাগল হ'য়ে গেছে,
সুবাস তারে বাড়ীর ভিতর আগ্‌লিয়ে রেখেছে।
গোমস্তা এক রাখ্‌লো বাড়ী বিষয়ের তদ্বিরে,
মন দিল গেরোস্তালীতে ধীরে ও সুস্থিরে।
দাসবংশের কর্ত্রী সুবাস, পাগল তাহার স্বামী,
বিবেচনা-বুদ্ধি তবু তীক্ষ্ণ এবং দামী।

অনেক টাকা করল খরচ স্বামীর চিকিৎসায়,
পূজা-মানৎ অনেক করেও সুফল নাহি পায়।
পাগল পাঁচু বলে শুধু, "লক্ষ্মী সুবাসিনী,
কোন্ পাপে হায় সারা জীবন তুমি বিষাদিনী ?
তোমার বাবা গেঁজেল্ পাগল্ পথের কুকুর ধ'রে,
এমন সোনার মেয়ের তরে নিলেন জামাই ক'রে !"
এই ব'লে সে উঠোনেতে ধুলায় গড়ায় কেঁদে ;
সুবাস তারে ঘরে নিলো আদর ক'রে সেধে'।
আঁচল দিয়ে গা মুছিয়ে, বসিয়ে খাটের 'পরে,
পরিয়ে কাপড় ধূলো ঝেড়ে পরম যত্ন ক'রে,
বলল চোখের জলে, "তুমি আমার ভোলানাথ,
বহু জন্মের তপস্যাতে পেলাম্ তোমার সাথ্।"
পাগল শান্ত হয়,
সুবাস ব'সে শিবদুর্গার গল্প তারে কয়।

অভাবগ্রস্ত সংসারে সেই আদরের দুলালী
ভোর হ'তে রাত খেটে খেটে করছে গেরোস্তালী ঃ
গোয়াল বাড়ান্, ঘর নিকানো, রান্না, উঠান-ঝাঁট,
বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কলসী-কাঁখে ঘাট,
ঢেঁকি-পাড়ান্, যাঁতা পেশা, কাজের নাইকো শেষ,
ময়লা কাপড় রুক্ষ চুলে কী অপরূপ বেশ !

গরু-দুটোর জাব দেওয়া, পাগল স্বামীর সেবা,
নাওয়ান্ খাওয়ান্,—কাজের তাহার অন্ত পাবে কেবা।
মাধবদাসের আদরিণী সুবাসিনীর সুখ,
দেখলে এখন কান্না আসে, যায় যে ভেঙে বুক!
অন্য মেয়ের দেখে তাহার জাগ্‌তো প্রাণের 'পর,
শ্বশুর-শাশুড়ী-দেওর-ননদ ভরা স্বামীর ঘর—
পাল্কী চ'ড়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে স্বামীর সাথে
মধুমাখা শ্বশুরবাড়ীর দুঃখ-গঞ্জনাতে।
উপায় ক'রে স্বামী বৌয়ের হাতে দেবে টাকা,—
বঙ্গনারীর কতই যে সাধ প্রাণে তাঁহার আঁকা।
হোক্ না গরীব তবুও তাহার স্বামীর বাপের ঘর,
সেই যে তাহার পরম আপন, বাপের বাড়ীই পর।
শ্বশুরবাড়ী লজ্জাভরে ঘোম্‌টা দিয়ে চলা,
গুরুজনের মুখে আহা, মিষ্টি 'বৌমা' বলা।
'মা' ব'লে যে সোনার খোকন্ ডাক্‌ল না তাহায়,
তাহার বুকের ক্ষীরের ধারা শুকিয়ে গেল হায়!
গহীন রাতে কাঁদে সুবাস নীরব অন্ধকারে।
'কাঁদিস সুবাস!' ব'লে পাঁচু জড়িয়ে ধরে তারে,—
"তোর না আছে দয়াল হরি, গরব করিস্ তার,
দয়াল তোরে দুঃখে ভাসায়, এই কি সুবিচার?
গেঁজেল ভাঙড় বেঁধে দিল ভগবতীর গলে!—
মিছেই তোর মাথা-খোঁড়া তুলসীগাছের তলে!

তোর সাধের ঐ তুলসীগাছ আর কেষ্ট-রাধার পট,
ফেল্‌ব ছিঁড়ে, ফেল্‌ব ভেঙে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট !”
ব’লে পাগল দরজা খুলে’ বাইরে যেতে চায় ;
চক্ষু মুছে সুবাস তাহার জড়িয়ে ধরে পায়,—
“লক্ষ্মী মাণিক, থাক্‌তে তুমি, আমার অভাব কি ?
কিসের দুখে সব থাক্‌তে, কাঁদ্‌তে যাব ছিঃ ?
তুমিই আমার সকল সুখ আর সবার সেরা ধন।
বাবা-মায়ের তরে যখন হু-হু করে মন,
তখন শুধু কাঁদি ব’সে ভেবে তাঁদের কথা,
তুমি আছো আমার বুকের জুড়িয়ে দিতে ব্যথা !”
সুবাস হাসে উজল মুখে কচি খুকীর মত ;
পাঁচু ভাবে,—‘সুবাস আমার মায়া জানে কত !
পাগল গেঁজেল হই,—
আমার দেবীর কাছে তবু দেবতা আমি রই !’

সেদিন প্রাতে এসে বলেন যদু গোমস্তা,
“খতের টাকা আদায় করা বড়ই হেনস্তা !
পাঁচখানি তামাদি খতে আদায় পাঁচশো টাকা,
নাও মা সুবাস, গোনা টাকা দুইটি তোড়ায় রাখা।”
হঠাৎ পাঁচু ছুটে এসে একটা তোড়া নিয়ে
বলে, “আমি কুষ্টে যাব,” জামা গায়ে দিয়ে

তৈরী হ'ল ; বল্‌ল সুবাস, "বল্‌ছ তুমি কি ?
অ্যাত বেলায় অনাহারে—একি খেয়াল, ছিঃ !"
"কুষ্টে গিয়ে খাব আমি, ভাবনা কিছুই নাই,
বেলাবেলি ফিরব বাড়ী, এখন তবে যাই।"
সুবাস নাহি খায়,
ভয়-ভাব্‌নায় পূবের সূর্য্য পশ্চিমেতে যায়।

* * * *

সন্ধ্যাবেলায় ফির্‌লো পাঁচু, চারটি মুটের কাঁধে,
গাঁট্‌-গাটরী নাম্‌লো এসে বাঁধা নানান্‌ ছাঁদে।
আদর ক'রে বল্‌ল পাঁচু "লক্ষ্মী সুবাস, এসো,
আমার হুকুম তামিল করো, চুপ্‌টি ক'রে বোসো!
আজকে আমি নইকো পাগল, সুবাসিনীর স্বামী,
পালন করতে হবে তোমায়, যা বল্‌বো আমি।
পরো দেখি এই জামা আর বেনারসী শাড়ী,
চুল বাঁধো এ জবাকুসুম মেখে তাড়াতাড়ি,
সিঁথেয় প'রে সিন্দুর আর আলতা প'রে পায়
দুর্গারাণী সাজতে হবে আজ ঠিক তোমায় !"
এই না ব'লে হাটে গেল পাঁচু তাড়াতাড়ি,
আন্‌লো কিনে চিতোল্‌ মাছ, দুগ্ধ-বোঝাই হাঁড়ি।
এসে দেখে, সত্যি সুবাস রাণীর মতন সেজে,
মঙ্গলচণ্ডী করছে প্রণাম লুটিয়ে ঘরের মেঝে।

দোর-গোড়াতে থম্‌কে পাঁচু, না পায় যেতে কাছে,
আঁধার ঘরে চাঁদের আলো আজকে নামিয়াছে !
গলায় আঁচল দিয়ে সুবাস প্রণাম করলো তায়,
পাঁচুর বুকের অনেক কথা গলায় আট্‌কে যায়।
খানিক থেমে বলে পাঁচু অশ্রুজলে নেয়ে,
"তুমি সুবাস, অনেক বড় সাবিত্রীর চেয়ে,—
আমার মতন লক্ষ্মীছাড়া, পাগল গেঁজেল মরা,
যমের বাড়ী থেকেই তুমি ফিরিয়ে আন্‌লে ধরা !
আবার আমি খুল্‌বো আড়ৎ মাধবদাসের মতো,
আন্‌বো ফিরে সব হারানো ধন-দৌলত যতো।"
সুবাস হেসে কয়—
"পাগল আমার, পেলাম্‌ তোমার আসল পরিচয়।"

---

# মালিনী মাসী



পথের ধারেই মালিনী মাসীর ঘর ।
এই গাঁয়ে কেন, সারা ভূভারতে কেউ নহে তার পর ।
ছিল সে বিষম আটপিটে আর ডান্‌পিটে মুখে দড়ো,
কথায় তাহার খই-ফোটা, নাহি কেয়ার্‌ করিত কারো ।
বয়সে যদিও বুড়ী ।
শীতের ভোরেও দেখো তার হাতে গোবর-গোলা ও নুড়ি ।
ঝাঁট্‌ঝুঁট্‌ দিয়া নেপিয়া পুঁছিয়া উঠান ঘরের দাওয়া,
মুংলী গরুর জাব্‌ মেখে দিয়ে গোপীনাথ-ঘাটে যাওয়া,

উঠনে বাড়ীতে দিয়ে সযতনে গোবর-ছড়া ও ঝাঁট্‌,
পালংএর খেতে জল দিয়ে সারে ভোরের কাজের পাট্‌।
তার পরে পাড়া-ঘোরা—
টোক্‌সা-পাড়ুনী মাসীর এ গাঁয়ে আর কেউ নাই জোড়া

"ওলো হরিশের মা,
পালংএর শাক এনেছি, এই নে, ঘণ্ট রাঁধিয়া খা।



দে-না মোরে দুটো কুম্‌ড়োর বড়ি, ঝোল ক'রে আজ খাবো,
বক্‌সী-পাড়ায় টোপাকুল পেলে আচার তোদেরে দেবো।

সর্দ্দি-জ্বরেতে মুখে নেই রুচি, কিছুই পারি না খেতে,
গোপালের মাসী তরকারী রাঁধে, আনিতে পারি না যেতে।
বুড়ো হয়েছি তো কম নয় ভাই, ছয়রত্ গেল পড়ে,
দু'বেলাই খাই মুংলীর দুধ, নইলে যেতাম ম'রে।
বেশ তো তোদের মাচাভ'রে কটা ঝুলিছে লাউএর জালি,
সে-দিনের ছেলে দীনু তো শিখেছে দিব্যি গেরোস্তালী!
দুঃখের কথা, যা বুনি বাড়ীতে, ছাগলে খাইয়া যায়,
আঁটকুড়েদের গরু-ছাগলের জ্বালায় মরিনু হায়!"
এই ব'লে মাসী আঙুলে লইল দন্তে পাতার গুঁড়া,
আচলে লইল বড়ি, আর লাউ, দিল হরিশের খুড়া।
বাড়ী চলে মাসী, রাস্তায় দেখা হ'ল তারিণীর সাথে,
চলিছে তারিণী সাদিপুরপাড়া দুধের কলসী হাতে।
টোপর-কপালী চাই কাল মাসী, আমার মেয়ের বিয়ে,
যেয়ো মাসী কাল সন্ধ্যায় ফুল টোপর-কপালী নিয়ে।
নানান্ কাজেতে ব্যস্ত আমি যে, খবর পারিনি দিতে,
বড় তাড়াতাড়ি, ব্যস্ত আছি যে কুটুম-স্বজন নিতে।"
অভয় দাসের ছেলেটা লায়েক্, জামাইটি হবে খাসা,
সুখে থাক্ তব জামাই ও মেয়ে,—মিটুক্ তোমার আশা!—"
এ কথা সে কথা নানান্ গল্পে, বেলা হ'য়ে গেল ঢের,
গল্পের নেশা পাইলে মালিনী কিছু না পাইত টের।

ফিরিল যখন বাড়ী—

মাসীর আদুরে বিড়ালের দল নিয়ে গেল আগুসারি'।

সন্তান-সন্ততি—

মালিনী মাসীর পাঁচটি বিড়াল সুবোধ সুশীল অতি!
তাহাদের নাম কালী, মনোরমা, শশী, টেঁপী, কমলিনী,
মুংলী গরুর নাল্‌কী বাছুর আদুরে মাতঙ্গিনী।
বিড়ালের তরে মাসী প্রত্যহ বাজারে মৎস্য কেনে,
মাছ না খাইলে বিড়ালমনিরা মরিবে আহার বিনে।
বিড়ালেরা বেশ নাদুস্‌ নুদুস্‌, গলায় পুঁতির মালা,
মাসীর বিজন কুটীর হইত তাহাদের রূপে আলা।
ছিল মালঞ্চে মালিনী মাসীর মাধবীলতার ঝাড়্‌,
কুন্দ, টগর, রঙ্গন ফুল ঘুমাতো ছায়ায় তার।
মালিনী কাটিত সোলার ফুল আর কপালী কদম-ঝরা,
চিত্র করিত তুলি দিয়া, পাশে সিঁদুর-গোলানো সরা।
বিয়ে-পৈতায় সকল পূজায় পার্ব্বণে শুভ-কাজে,
মালিনী মাসির মাঙ্গলিকের শুভ চিহ্নিকা রাজে।
রথযাত্রায় গোপীনাথ-বাড়ী সাজাতো সিংহাসন,
সোলার পদ্মে কদম ফুলেতে অপরূপ সুশোভন্‌।
শিল্পকার্য্য করিয়াও নিতি পাড়ায় টোক্‌সাপাড়া,
ব্যাপার-বিধানে কাহারও বাড়ী মালিনী পেতো না ছাড়া
বঁটি পেতে ব'সে তরকারী কোটা, মুখেতে দোক্তাপান,
বকর্‌-বকরে সারাদিন মাসী না হইত হয়রান্‌!
গাঁয়ের গেজেট্‌ স্বর্ণমালিনী, যথা তথা তার গতি,
'মায়ের ব্যারাম'-এ চিকিৎসাতেও ছিল তার সুখ্যাতি!

বালবিধবা সে, আত্মস্বজন কারো ধারিত না ধার,
অসুখে বিসুখে দেখিত বিধবা বোনঝিটি ছিল তার।
অভাব ছিল না কিছু,
লক্ষ্মীপূজায় চাষী গৃহস্থ দিতো ধান ঘর-পিছু!

মুখরা মালিনী মাসী,
কোঁদলে তাহার গলার আওয়াজে ঝন্‌ঝন্ বাজে কাঁসি!
নামকরা যত কুঁদুলী—হারানী, খেমী, পলানের মা,
মালিনীর কাছে তাদের গলার ফুটিত না কভু রা।
একবার কার এঁড়েগরু তার উঠান খচিয়াছিল,
মাসী মহা রেগে গরুটারে বেঁধে নিজেই খোঁয়াড়ে দিলো!
গরুর মালিক আসিলে তাহারে ঝাড়িল এমন ঝাল্,
মালিনীর ভয়ে রাখালেরা দূরে চরাতো গরুর পাল।

* * *

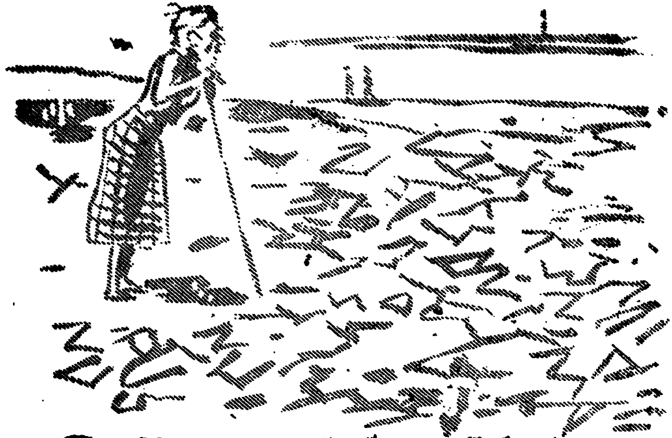
নষ্টচন্দ্রারাত্রে সে-বারে মাসীর ঘরের কাছে,
দুষ্ট ছেলেরা 'ঢেঁকীশ্বরী'রে চুপিচুপি পূজিয়াছে!
ঝাঁটা-ঝুড়ি-চট-শোভিত সে ঢেঁকী কিম্ভূতকিমাকার,
শেষরাতে মাসী দেখি সে মূর্ত্তি জুড়ে দিল চীৎকার।
ছুটিয়া আসিল ভবানী ও খেড়ু, বুদে, গয়ানাথ পাল,
কেউ হেসে হেসে গড়াইয়া পড়ে, কেউ রেগে হয় লাল।
মালিনী কিন্তু হেসে গাল দেয়—"ড্যাক্‌রা ছোড়ার পাল,
বিহারীবাবুরে ব'লে পাজীদের তোলাব পিঠের ছাল।

বাঘের ঘরেতে ঘোগের বাসা রে !—” মাসী রাগে আর হাসে,
ভীতবিড়ালেরা ম্যাও ম্যাও ডাকে দাঁড়ায়ে মাসীর পাশে।
জ্বরবিকারেতে শয্যা যে নিলো, উঠিল না মাসী আর।
কাহারও ওষুধ নিলো না মুখেতে—কবিরাজ ডাক্তার।
মালিনী মুদিল চোখ—
পল্লীর সব মায়ের পরাণে বাজিল ভগিনীশোক।



শুনাতেছিলেন বাবুর হুকুম প্রজাদের সব ডেকে' (এরফান মাতব্বর)

( শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে )



# এরফান মাতব্বর

চর চাঁদপুর গাঁয়ের মোড়ল এরফান মণ্ডল
চেনিরদ্দির যোগ্য ব্যাটা সে, বংশের সম্বল।
সারা গ্রাম তারে মান্য করিত বলিয়া মাতব্বর,
তারি বুদ্ধিতে বহু ভাঙু নিয়া বেঁধেছিল বাড়ী-ঘর—
চর চাঁদপুর ভবানীপুরের পুরোণো কোলের ধারে,
চরের প্রজারা 'চাচা' বলি' ডাকে মোড়ল এরফানেরে।
সেবারে বর্ষা-অন্তে উঠিল জ্যৈষ্ঠ করের ছাম্
কোশাখালী চর সোনার ফসলে পুরাবে মনস্কাম।
ঠাকুরবাবুরা পাবেন এবারে নজরের মোটা টাকা,
যে কোনো প্রকারে এই ছাম্ থেকে কিছু জমি চাই রাখা
মাখনের মত পলিমাটি রোদে হাসিতেছে চক্‌চক্‌,
ঝাউ-বনাজের ধারে দলে দলে উড়িতেছে কত বক।

অম্বাচরণ আমিন এলেন করিতে জলির ছাম্
এরফান তাঁর সাথে সাথে ঘোরে, মোছে কপালের ঘাম।
ভবানীপুরের হাদেক্ ব্যাপারী চাষী সঙ্গতিপন্ন,
করে অনুরোধ এই জমি থেকে দুইশো বিঘার জন্য।
চাষী-ভাইদের তরে কিছু জমি করে এরফান আশ,
এক চাঁদপুরে পঞ্চাশ ঘর গরীব চাষীর বাস।
চাষী না হ'লে কি বুঝিতে পারে গো জমির কেমন ক্ষুধা,
কেড়ে নিতে চায় মাটির মায়ের বুকের লুকানো সুধা।
কর্জ করিয়া কিনিয়াছে তারা লাঙল, হালের গরু,
জমির অভাবে মরিবে তাদের কাচ্চা-বাচ্চা জরু।
জ্যৈষ্ঠকরের জমিতে এবারে ফলিবে সোনার ধান,
লোভী চাষীদের জিদ্ বেড়ে গেল, প্রাণ করে আন্‌চান্।
এরফান আর হাদেকের দল আমিনবাবুরে ধরে।
আমিন বলেন, "বন্দোবস্ত হইবে ডাকনজরে।
বন্দোবস্ত-দিনে তোরা সবে সদর-কাছারি যাস্,
অগ্রিম সিকি নজর না দিলে পুরিবে না কারো আশ।"

বন্দোবস্ত-ধার্য্য-দিনেতে, উভয় দলের জিদে,
বিঘাকরা জলি পঁচিশটাকা-ই ডাকিয়া ফেলিল সিধে
ঠাকুরবাবুর কৃষিব্যাঙ্ক্ থেকে কর্জ করিয়া টাকা,
এরফান সহ পঞ্চাশ ঘর তমসুক্ দিলো পাকা।



তিনশো বিঘার জ্যৈষ্ঠকরেতে উল্লাসে দিলো চাষ

( শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে )

তিনশো বিঘার জ্যৈষ্ঠকরেতে উল্লাসে দিলো চাষ।—
ভীষণ খরায় খাঁ-খাঁ করে রোদ—আসিল চৈত্রমাস।
কপালের দোষে—বোশেখমাসেও হ'ল না একটু জল;
মাটিফাটা রোদ, চরে বালি ওড়ে, সে যেন মরুস্থল!
বালি ফুঁড়ে ওঠে জ্যৈষ্ঠকরের সাধের নেওয়াল্ মাটি,
পলিমাটি গেল সারা চরময় পাটালির মত ফাটি'!
চারা ধানগাছ পুড়ে খড় হ'ল, এরফান কাঁদে, "হায়,
কাঙাল ভাইরা, তোদের কপাল আগুনে যে পুড়ে যায়!"

* * *

জ্যৈষ্ঠ-অন্তে আষাঢ়ে আগাম হু হু ক'রে এলো বর্ষা,
আধ হাত উঁচু চারা ধানগাছ জলে ডুবে হ'ল ফর্সা!
হাদেকের ছিল বরাতের জোর, জমি তার ছিল নীচু,
কালের খাপালে দু'শো বিঘা তার স্যাঁতসেঁতে ছিল কিছু!
হাদেকের দল আল্লারে ডাকে কাটিয়া আগুড় ধান,
আঁটি বেঁধে ধান রাখে পালা ক'রে, গাহে ভাটিয়াল গান।
আশ্বিন মাসে। চন্দ্র নন্দী নায়েব করে তাগাদা,
এরফান শুধু ভাবে আর ভাবে মুখখানা ক'রে সাদা!
জমাবন্দী ও চিঠা খতিয়ান্ এলো ডিহী কাছারীতে,
উমির-ছা'বের পাইকেরা এলো টাকার তাগাদা দিতে।
বালির বদলে এতগুলি টাকা লইবে বানায়ে বোকা,
এত ক'রে হায় দেখানু বোঝানু, নায়েবটি একরোখা।
কায়েমী জমিও কয়েক বিঘের খাজানা তামাদি হবে,
তার তাগাদায় কাছারীতে ডেকে হুমকি বা দেবে কবে!

এতগুলো হায় গরীব চাষীর এম্‌নি কপাল পোড়া,
জ্যৈষ্ঠকরের সেলামী মকুব লাগিয়া বৃথায় ঘোরা!
দরখাস্তের হুকুম হ'ল না,—ফসল পেয়েছি ব'লে,
রাজার টাকা কি প'ড়ে থাকে, বাবু, ধান যদি ভাল ফলে?
এত ধরাধরি খোসামুদি করি, তবু নাই বিশ্বাস,
দাড়ী চুলকায় এরফান চাচা, ছাড়িয়া দীর্ঘশ্বাস!

বুকভাঙা হ'য়ে এরফান চলে গরু লয়ে ঝাঁপাবার,
কোলের পারেই দেখে হাসিমুখে আসে ছবু নানা তার,
হেসে বলে, "কাল এসেছেন বোটে রবিবাবু মহাশয়,
শিলাইদহের ঘাটে আজ বহু প্রজা জমায়েৎ হয়।
তুই একবার যা না এরফান, দরবার ক'রে আয়,
তাঁর রাজত্বে টাকা দিয়ে কিরে ফুট্‌বালি কেনা যায়?"
লাফাইয়া উঠি এরফান চলে, লিখে নিলো দরখাস্ত,
রহিম মোল্লা লিখিল ঘামিয়া শুনে এ খবর ব্যস্ত!
কাঁধে গামছা, হাতকাটা জামা গায়ে এরফান চলে,
বাবুমশায়ের কাছে দরবারে চলে প্রজা দলে দলে।
বিকাল নাগাদ এরফান ও ছবু শিলাইদা' পৌঁছিল,
ভিড় ঠেলে বহু কষ্টে বাবুর পায়ে নজরানা দিলো।

হেল্‌না চেয়ারে বাবুমহাশয় বসিয়াছিলেন তীরে,
ম্যানেজার আর হাজারো প্রজায় রেখেছিল তাঁরে ঘিরে।

বরকন্দাজ ও আমলাবাবুরা টেবিলে কাগজ রেখে,
শুনাতেছিলেন বাবুর হুকুম প্রজাদের সব ডেকে।
হাঁটু গেড়ে ব'সে বলে এরফান, "ধর্ম্মাবতার হুজুর!
বাপ্‌দাদাদের আমল হইতে মোরা তো রাজার মজুর!



ভৈরবপাড়া-সীমানা মোরাই কায়েম রেখেছি ঠিক,
আজ আমাদের জবান্ মিথ্যা! মোদের নসিবে ধিক্!
ভুল বুঝে' মোরা জ্যৈষ্ঠকরের পলিঢাকা শুধু বালি,
মুখ্যু আমরা, ল'য়ে জেরবার্ জিদের বশেতে খালি!
কৃষি-ব্যাঙ্কেতে করেছি কর্জ কাঙাল প্রজারা মোরা,
নাহি পাইলাম এককাঠা ধান, পড়িলাম চোর ধরা!

হুজুরেরি টাকা, হুজুরেরি জমি,—ইহাই মোদের রুজি,
কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কোনমতে আছি চরে মাথা গুঁজি।”
বাবুমহাশয় কহেন আমিনে, “ফসল পায়নি এরা ?
এত টাকা যার নজর, সে জমি হওয়া তো উচিত সেরা।”
মাথা চুল্‌কায়ে কহেন আমিন, “সরেস্ জমিই ছিল—
জ্যৈষ্ঠকরের ঢালির উপরে, বৃষ্টি যে নাহি পেলো।”
বাবুমহাশয় গালে হাত দেন, মুখখানা হয় লাল,
দরবার চাহে আরো কত প্রজা, করে নানা গোলমাল।
বাঁশীর মতন সুরে কন্ বাবু, “তোমরা তো চাষী খাঁটি,
এত কাল ধ'রে চাষ ক'রে তবু চিনিলে না, হায়, মাটি ?
জেদাজেদি ক'রে নিজের ও পরের এমন ক্ষতিই করো,
ধার-কর্জতে এতগুলো চাষী এমনি ক'রেই মরো।”
ছল-ছল করে বাবুর দুইটি পটোলচেরা সে চোখ,
হাঁ ক'রে তাঁহার মুখপানে চায় যত ছিল প্রজালোক।
বাবুমহাশয় হুকুম দিলেন, “নজর খাজনা মাফ,
ব্যাঙ্কের দেনা লাগিয়াও যেন নাহি দেওয়া হয় চাপ্।
মাল-তহবিল হইতে সে টাকা ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে নিও,
নজর খাজনা মকুব করিয়া, তমসুক ফিরে দিও।”
সোনার বরণ হাত দিয়ে বাবু হুকুমে দিলেন সই।
এরফান কহে, “তুমি বাপ রাজা, মোরা তব ছেলে হই ;
ছেলেরা বাঁচিল আজ তাহাদের সত্যি বাপেরে পেয়ে।”
ছল-ছল চোখে বাবুমহাশয় রহিলেন শুধু চেয়ে।



# রাখালবৈরাগীর ভিটে

ফৌত্ ভিটে, ফৌত্ ভিটে, করছো খাঁ খাঁ দুপুর রোদে,
তোমার বুকে শেয়াল-কুকুর বেড়ায় ঘুরে কী আমোদে !
কোথাও তোমার সর্ষে হাসে, কোথাও কাঁদে ভাঁটীর বন,
পথিক চলে পথটি দিয়ে, চেয়ে থাকো অনুক্ষণ ।
তোমার বুকে সোঁ সোঁ হাওয়া চুপিসারে সুধায় তাই,
“ভিটের মালিক কোন্ শ্মশানে চিতায় পুড়ে হ’ল ছাই ?”
শূন্য ভিটা ! বল্‌তে পারো, তোমার বুকে ছিলো কারা
কান্নাহাসির সুখ মিটায়ে আজকে কোথায় গেল তারা ?
বছরদশেক আগে যারা তোমার বুকে মাথা রেখে,
কত আশায় বাঁধলো রে বুক তোমার ধূলো অঙ্গে মেখে,

তোমার বুকে তাদের শিশু দিয়েছিল হামাগুড়ি,
তাদের বধূ শুয়েছিল সুখে দিয়ে আঁচলমুড়ি।
ভালবেসে দেহের তাপে তোমায় আদর করেছিলো,
শুদ্ধমনে গোময় দিয়ে কোমল হাতে নিকিয়েছিলো।
তোমার বুকে বেলপাতা, ফুল, তুলসী কত খেতো চুমো,
নিপুণ হাতের আলিপনায় কতই দীপ আর কতই ধূমো।
গৃহীর যত দেবদেবী তোমার বুকে পূজো নিলো,
তোমার বুকে মাথা রেখে আশীষকামী প্রণাম দিলো।
রচেছিলো কুঞ্জকুটির হরিভক্ত রাখাল দাস,
দেশবিদেশের ভক্ত সাধু মিলতো হেথায় বারোমাস।
তোমার বুকে সারাজীবন পেয়েছিল স্বর্গসুখ,
তোমার বুকে আজ দেখিনে তাদেরি সেই হাসিমুখ!

তোমার বুকে ঘুঘু চরে আজকে গেয়ে করুণ গান
শেয়াল-কুকুর বিষ্ঠা ফেলে, হায় কি তোমার অপমান!
তোমার বুকে জোছ্‌নারাতে সে দম্পতি সঙ্গোপনে,
জাগতো বাসর রঙীন্ চোখে আলিঙ্গনে আলাপনে।
তোমার বুকে হাস্‌তো মধুর বধূর জ্বালা সন্ধ্যাদীপ,—
হায় গো সেথায় মাটি খোঁড়ে আজকে কত বন্যজীব!
মনের মত সাধের বাড়ী সাজিয়েছিল রাখাল দাস,
খোল করতাল কীর্ত্তনেতে মুখর বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাস।

রাখাল তাহার বৌএর সাথে আঁকতো মুখে তিলক-ফোঁটা,
গন্ধরাজের দুইটি ফুলের ছিল যেন একটি বোঁটা।
কে বল্‌বে আজ এই শ্মশানে দোলের মধু জোছ্‌না রাতে,
গাইতো রাখাল বিভোর হ'য়ে সুর দিয়ে তার একতারাতে!



বোষ্টমী তার গাইতো সাথে, স্বামীর সাথে রাঙিয়ে ফাগে,
ফাগুন হাওয়া মাতাল হ'ত যুগল কণ্ঠের অনুরাগে।
নাচ্‌তো তাদের শিশু কানাই তালে তালে নূপুর পায়ে,
বাপ-মা তাহার হর্ষে বিভোল, চুমু খেতো মুখে গায়ে।
আসতো পাড়ার পুরুষ-মেয়ে, কী আনন্দে খেলতো রং,
আজো চোখে ঝিলিক্ মারে হাসি গান আর নাচের ঢং।

আসতো গাঁয়ের বৈরাগীরা, চলতো মহামহোৎসব,
খোলকরতাল-হরিধ্বনির আনন্দময় কলরব।
আস্‌তো বাউল, খ্যাপা, খেপী, সাধু, ফকির, বৈরাগী,
ছিল মধুর ভাণ্ড হেথায়, আস্‌তো সবাই তার লাগি'।
হায় গো শ্মশান শূন্য ভিটে, সে ব্রজধাম কোথায় আজ!
তোমায় দেখে স্মৃতির ভারে, উঠ্‌ছে কেঁপে বুকের মাঝ!
ঝড়-বাদলে বৃষ্টি-ধারা আজকে তোমার বুকে বেঁধে,
রাখাল দাসের বৌ থাকলে, দেখেই যে সে মরতো কেঁদে।
তোমার বুকের কুটাটুকু, হঠাৎ আসা কাদামাটি
সে গৃহিণী পারতো যে হায় নিতে তাহার জিভে চাটি'।
তোমায় দেখে কান্না যে পায়, হায় গো তুমি লক্ষ্মীছাড়া,
স্মৃতির বোঝা নিয়ে মাথায় আজো তুমি আছো খাড়া?
গেঁয়ো তুমি সেকেলে গো, যাও না খ'সে পচে ম'রে।
গড়বো মোরা সহর নগর, নতুন সাজে নতুন ক'রে।




ঐ যে হোথা বালুর উপর কাহার ছেঁড়া মাদুর-বালিশ
মরা গাঙের কোলের ধারে প'ড়ে আছে, বল্‌তে পারিস্ ?
জলের ধারে আধেকখানি ছেঁড়া মাদুর করে স্নান।
কোন্ কালে কার চিতার আগুন এইখানে শেষ হ'ল ম্লান ?
কার দেহটি হেথায় এসে চিতায় পুড়ে' হ'ল ছাই ?
হায় ! সে মানুষ কেমন ছিল, তার কি কোনই চিহ্ন নাই ?
গরীব সে কি ? কোন্ জাতি সে ? নাই কি তাহার ইতিহাস ?
ওগো মৃত ! তোমায় স্মরি' ফেল্‌ছি আমি দীর্ঘশ্বাস।

ঐ যে হোথা নদীর জলে আধেক ডোবা বাঁশটি কাঁচা
বল্‌ছে, হেথায় একটি মানুষ শেষ করেছে হাসা-নাচা।

সে যে তাহার স্মৃতির জ্বালা শেষ করেছে চিতায় উঠে',
পেয়েছে সে পরম বিরাম সারা জীবন খেটেখুটে।
কেঁদেছে তার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী বা স্বামী, বাপে মায়ে,
তাদের ব্যথা জড়িয়ে আছে আজো উহার সকল গায়ে।
বেঁচে থাকার দাবাগ্নি তার নিভে গেছে এই শ্মশানে,
নদীর হাওয়া কত শীতল দগ্ধ তাহার প্রাণই জানে।
তার জীবনের ব্যথার বীণা মিশ্‌ছে নদীর কলগানে,
ব্যথার ক্ষত শুকায়নিকো আপন জনের গোপন প্রাণে।

ঐ ওপারে নদীর বাঁকে তেঁতুলতলায় ঝাউএর সারে—
কারা যেন হ্যায় 'হরিবোল' নিবু নিবু চিতার ধারে।
সন্ধ্যা-আকাশ ব্যথায় গুমোট, শুধুই নদীর রোদন-গান,
দিনের আলো করুণ হেসে গ্রামের মাথায় চাইছে ম্লান!
বাঁশের মাচা, কলসী, দড়ি, মাদুর, বালিশ নীরব চায়,
চিতার আলোয় দ্যাখো তাদের চোখের কোণে জল যে হায়।
হেথায় হোথায় কলসী ভাঙা, পোড়াকাঠ আর কয়লা-গুঁড়া,
স্মৃতি-রক্ষার নাইকো বালাই,—বড়লোকের মঠের চূড়া।
দীনদুঃখা, হতভাগা,—মান যশ যার গায় না কেউ,
তারাই হেথায় সুখে ঘুমায় বুকে নিয়ে নদীর ঢেউ!
তারাই গাঁয়ের চাষী, গৃহী, চাকর, মজুর অধম দীন,
ঘুমিয়ে আছে নরনারী মহাকালের চরণ-লীন।

এই যে কাছেই রয়েছে কার হাতের নোয়া ভাঙা শাঁখা,
কোন্ সে সতী রেখে গেছে শেষ এয়োতীর স্মৃতিমাখা!
কাদার উপর কার দেখা যায় লালপেড়ে ঐ ময়লা শাড়ী,
কল্জে রেখে এ নির্জ্জনে কোন্ নারী হায় ফির্লো বাড়ী?
এই বালুতে সে অভাগী ঢেলেছে তার চোখের জল,
গাংশালিকের ডাকে শুনি তার সে কান্না অবিকল!



হায় অভাগা, হায় অভাগী! তোদের তরে প্রাণ ফাটে,
তোরাই আবার আয় রে ফিরে পল্লী-মায়ের মাঠে-বাটে!
অমানিশার অন্ধকারে শ্মশানকালী নাচেন যখন,—
শ্মশানেশ্বর শিঙার রবে নাচান সে প্রলয়-নাচন ;

সেই নিশীথে ঘোর আঁধারে আসবো আমি এই শ্মশানে,
বলবো, মাগো সর্ব্বনাশী, বাঁধলি মা বুক কী-পাষাণে ?
মৃত্যুরূপা ন'স মা কেবল, সৃষ্টি যে তোর আসল প্রকাশ,
তোর কোলেরই ছেলে-মেয়ের নূতন জীবন কর্‌ মা বিকাশ।
তোর নাচনে তাথৈ তাথৈ মহাকালার নৃত্য চলুক্‌ ;—
এই শ্মশানের শবরা উঠে' নূতন প্রাণের আলো জ্বালুক্‌।

---




## শিকারী বিশ্বনাথ

বাবুমশায়ের চরণে করিলা সম্ভ্রমে প্রণিপাত।
পায়ের তলায় বসি' বুড়ো নিয়ে বাবুর পায়ের ধূলি,
তারি এককণা জিভেতে ঠেকায়ে মাথায় লইল তুলি'।
বৃদ্ধ হইলেও দেহখানা তার লোহা দিয়ে যেন পেটা,
যৌবনে ছিল কেমন জোয়ান, বেশ বোঝা যেতো সেটা।
ভুরুর রোঁয়া ও মাথাভরা চুল তুলোর মতন সাদা,
সাদা রোমে ভরা বুকখানা তার হাড়ে ও মাংসে গাদা।
মুখে ছিল তার সাদা দাড়ি-গোঁফ, দু'চোখ বাঘের মত,
লেখা ছিল তাতে বয়স-কালের বীর্য্যকাহিনী যত।
মুখখানি তার হাসি-খুসী বড়, বাবুরে পেয়েছে আজ—
ছেলেবেলা যাঁরে দেখিয়াছে বিশু মাথায় জরির তাজ,

ফুট্‌ফুটে ছেলে ননীর পুতুল, টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে,—
বিশুই থাকিত সঙ্গে সদাই, কখন্ বা যান প'ড়ে।
শিখায়েছে তাঁরে ঘোড়ায়-চড়া আর বন্দুক চালানো,
সকালে বিকালে ঘোড়ায় চড়িয়া গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়ানো।
শিকারেও তাঁরে সঙ্গে নিয়েছে বসায়ে হাতির 'পরে,
শিখায়েছে কত শিকারের তাগ্ নিজে হাতে ক'রে ধ'রে।
সেই খোকাবাবু আজ জমিদার, বড় আনন্দ তার,
গল্প শুনিতে ডেকেছেন তারে আজ তারি জমিদার।

পদ্মার ধারে বুনোপাড়া-মাঝে বিশ্বনাথের বাস,
পাঁচ-ছয় বিঘে চাক্‌রান জমি, তাতেই করিত চাষ।
লাল আলু আর ভুট্টা-মকাই, মান ও কচুর খেত
তৈরী করিত ঝুড়ি সাজি কত কেটে বাঁশ আর বেত।
কাচ্চা-বাচ্চা ছিল নাকো তার, শুধু এক 'ভাতিজা'
চাম্‌রু তাহার সেরা সাক্‌রেদ্, যেন তার কলিজা।
শুয়োর সজারু মেরে মজা ক'রে খুবই মাংস খায়,
কুকুর লইয়া প্রায়ই দলে-বলে গ্রামে শিকারেতে যায়।
বুনোপাড়া-মাঝে সেই ছিল বড়, সর্দ্দার মাতব্বর,
খাতির তাহারে করিত বুনো ও বিন্দীরা যাট ঘর।

বাবুর পায়ের কাছে

ভারী খুসীমনে বিশু এসে বসে, চামরু বসিল পাছে।

বাবুমহাশয় কহিলেন, "বিশু, বহুদিন দেখা নাই ;
নাটোরের সাথে লড়ায়ের কথা আজকে শুনিতে চাই।"
হেসে বিশু কয়, "শোনো বাবু, বলি সে মজার ঘটনা,—
নাটোর এনেছে একশো লেঠেল্ পড়ে গেল রটনা।
জমির দখল পাবার লাগিয়া বহু সড়কী ও লাঠি,
আনিয়াছে তারা বন্দুক বহু, লাল ক'রে দেবে মাটি।
নায়েবমশাই পাঠালেন বহু বড় বড় লাঠিয়াল,
পঞ্চাশজন চলিল সেথায় লয়ে লাঠি-তরোয়াল।
আমি পারি শুধু শিকার করিতে শুয়োর সজারু বাঘ,
পড়িল না ডাক, মনেতে আমার গুমরিয়া মরে রাগ।
ছোটলোক, বুনো,—লেঠেল্ হই নি, বড় দুখ হ'ল মনে।
মনের ঘেন্না নিয়ে রহিলাম বাড়ীতে চাম্রু-সনে।
পরদিন শুনি, আমাদের সব লেঠেল পালিয়ে এলো,
নাটোরের লাঠি-সড়কীর ঘায়ে দৌড়িয়ে এলোমেলো।
নাটোরের দলে বিস্তর লোক, বন্দুকও ছিল বটে,
লাঠিয়াল তারা, বন্দুক-ছোঁড়া জানে না কেহই মোটে।
আওয়াজ করেই দেখাইয়া ভয়, ফাঁকি দিয়ে জিতে যায়!
মোদের ডবল লেঠেল তাদের,—আমি করি হায় হায়!
নায়েবমশাই ডেকে পাঠালেন—"শুন গো বিশ্বনাথ,
বন্দুক নিয়ে তুমি একবার যাও ইহাদের সাথ!"
চলিলাম আমি নিয়ে বহু টোটা, বন্দুক-হাতিয়ার,
মাঠে গিয়ে দেখি, ঘিরেছে নাটোর দিয়ে লেঠেলের সার।

বন্দুক ধ'রে দাঁড়ালাম আমি, পাছে আমাদের দল,
করিনু পাঁচটা আওয়াজ, নাটোর পিছায়ে লইল বল।
আমারে দেখিয়ে এগিয়ে আসিল পাঁচজন সর্দ্দার,
গর্জিনু আমি, "কাছে আসিলেই মরিবে, খবর্দ্দার।"



আমার হাতের নির্ঘাৎ গুলি সর্দ্দারদের পায়
দ্রিম্ দ্রিম্ ক'রে গর্জিল, তারা মাটিতে পড়িয়া যায়!
তার পরে আমি ছাড়িলাম আরো কয়েকটা ফাঁকা গুলি,
দলে দলে যায় নাটোরের দল 'পালা পালা' রব তুলি'।
জমির দখল লইলাম মোরা, মোদের প্রজারা এলো,
দলে দলে এসে যত ধান ছিল সব কেটে নিয়ে গেলো।

ফৌজদারী বেধে গেল;
আমাদের আর নাটোরের সব বন্দুক কেড়ে নিল,
পুলিশেরা সব রেখে দিল নিয়ে কুষ্টের আদালতে ;
কে খুন করেছে বিচার তাহার হইবে আইনমতে।
কুষ্টেয় ছিল সাহেব হাকিম, শিকারেতে খুব সখ,
জগতীতে এলো বড় বাঘ এক, ভীত সবে ভয়ানক।
কেহ পারিল না মারিতে সে বাঘ, দেশময় সাড়া প'ল,
সাহেব আমারে চিনিতেন ভাল, আমারে তলব হ'ল।
সেলাম ঠুকিয়া সাহেবে কহিনু, "বন্দুক ভালো চাই,
যেমনি হউক, এই বাঘ আমি মেরে দিয়ে চলে যাই।"
সাহেব কহিল, "মালখানা থেকে বন্দুক বেছে নাও
মারিতে হইবে এই বাঘ আজি বক্‌শিশ যদি চাও।"
আমি ও চাম্‌রু দেখে-শুনে দুটি ভাল বন্দুক নিয়ে
বাঘ মেরে দিনু। সেই দিনই আমি চামরুর হাতে দিয়ে
পাঠায়ে দিলাম সেই রাতারাতি বন্দুক আমাদের।
ভেল্কির মত কি কাজ করিনু, কেহ না পাইল টের!
বড় খুসী হ'ল সাহেব হাকিম, মুখখানা হাসিমাখা,
'সাবাস্ সাবাস্' ব'লে দিল মোরে বকশিশ বিশ টাকা।
অত বড় বাঘ দেখে নাই কেউ। ফিরিনু সেলাম ঠুকে ;
ম্যানেজারবাবু বলেন 'সাবাস্' থাবা দিয়ে মোর বুকে।
ঠাকুরবাবুর বন্দুক নাই কুষ্টে মাল্‌খানায়,
প্রমাণ-অভাবে সেই ফৌজদারী নষ্ট হইয়া যায়!

অত বড় ভারী খুনী মাম্‌লাটা হয়ে গেল ডিস্‌মিস্‌ ।
ম্যানেজারবাবু দিলেন আমারে দশ টাকা বক্‌শিশ ।
বড় বড় বাঘে জাগায়ে রাগায়ে সাম্‌নাসাম্‌নি মারি,—
বাপদাদাদের আশীষে শিকারে আজিও যাইনি হারি' ।
ও চরণ হুজুরের—
বুকে রেখে আমি জবর্‌ জবর্‌ শিকার করেছি ঢের ।

শুনে খুসী অতিশয়,
বাবু মহাশয় বিশ্বনাথের পেয়েছেন পরিচয় ।
বিশু রাখিয়াছে নিজ বীরত্বে ঠাকুরবাবুর মান,—
মাসে মাসে বিশু আজীবন পাবে দশ টাকা পেন্‌শান ।
বিশুর ভাতিজা চ্যাংড়া বাচ্চা চামরুও বারোমাস
মাইনে পাইবে, বড় কাছারীর কাটিবে ঘোড়ার ঘাস ।
শিকারী বিশ্বনাথ ।
বাবুমশায়ের চরণে করিল বার বার প্রণিপাত ।

শেষ

SARASWAT LIBRARY
Estd:-1919